পরিষেবা
আপনার স্বপ্নের বাড়ি গড়ার বিশ্বস্ত সঙ্গী।
9591 475600

ই-জার্নাল

সাহিত্যসেনা

গবেষণাধর্মী পত্রিকা

Mail
sahityasena@gmail.com
Whatsapp
8617377896

Volume No : 01, Issue No : 03, Sahityasena Journal, February : 2026, E-mail: sahityasena@gmail.com, Website : www.sahityasena.com

সম্পাদকীয়

সরিফুল ইসলাম

২০০৬ সালে সাহিত্যসেনার পথ চলা শুরু হয়েছিল অফলাইনে, সাহিত্যকেন্দ্রিক মনোযোগ নিয়ে– সৃজনশীল রচনা ও সমালোচনামূলক আলোচনার মাধ্যমে। অনলাইন প্রকাশনার পথে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিসর বিস্তৃত হয়েছে, যা সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সংযোগকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে প্রতিফলিত করে। সাহিত্যসেনার মতো একটি গবেষণাধর্মী পত্রিকা কেবল সাহিত্যিক সৃজনশীলতার সীমায় আবদ্ধ থাকতে পারে না; এটি স্বভাবতই নানা শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত।

আমরা সাহিত্যসেনার দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করছি, একে বিভিন্ন একাডেমিক শাস্ত্রের গবেষণার সঙ্গে যুক্ত করে। বাংলা ও ইংরেজি–দুই ভাষায় প্রকাশিত এই পত্রিকা আন্তঃবিষয়ক সংলাপকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে তৈরি, যাতে এটি বৃহত্তর পাঠকমণ্ডলীর কাছে পৌঁছাতে পারে। এই রূপান্তর এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে, যেখানে সাহিত্যসেনা সাহিত্য ও অন্যান্য শাস্ত্রের সংযোগস্থল অন্বেষণ করে, জ্ঞানের বিনিময় ও সূক্ষ্ম বোঝাপড়াকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এই সম্প্রসারণের মাধ্যমে আমরা গবেষকদের আহ্বান জানাই নানা বিষয় নিয়ে যুক্ত হতে, ভাষা ও শাস্ত্রের সেতুবন্ধন ঘটাতে। সাহিত্যসেনার এই বিকাশ আমাদের বৌদ্ধিক অনুসন্ধান ও বিনিময়ের প্রতি অঙ্গীকারের প্রতিফলন। সবার কাছে পৌঁছে যাওয়ায় আমাদের মূল লক্ষ্য।

সাহিত্যসেনা পত্রিকার পিয়ার রিভিউ কমিটির সদস্যবর্গ :
১) ড. পবিত্র সরকার, বিশিষ্ট ভাষাবিদ, প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
২) ড. দীপককুমার রায়, উপাচার্য, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়।
৩) কবি কমল দে সিকদার, সভাপতি লিটল ম্যাগাজিন ফোরাম, কলকাতা, অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার,রাজ্য বিদ্যুত পর্ষদ।
৪) ড. মীর রেজাউল করিম, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ। প্রাক্তন ডিন, মানবিক বিদ্যা ও ভাষা অনুষদ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।
৫) ড. উৎপল মণ্ডল, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।
৬) ড. দিলীপ দেবনাথ, অধ্যাপক, রসায়ন, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়।
৭) ড. প্রদীপ চৌহান, অধ্যাপক, ভূগোল, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।
৮) ড. সনাতন দাস, অধ্যাপক, অঙ্ক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়ার্ল্ড টপ টু-পারসেন্ট সাইন্টিস্ট।
৯) ড. মৃণালচন্দ্র দাস, সহকারি অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, সংস্কৃত বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।
১০) ড. মোহাম্মদ আব্দুল অহাব, ইংরেজি, অধ্যক্ষ, দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজ, হরিরামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।
১১) ড. সলিলকুমার মুখার্জি, অধ্যক্ষ, কমার্স, সামসি কলেজ, মালদা।
১২) ড. ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,

নাট্যকলার সন্ধানে

ড. মনোজ ভোজ

নাট্যকলার সঙ্গে যুক্ত যাঁরা তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন, নাট্যনির্মিতির মূলে থাকে এক সুখকর বেদনার ইতিহাস। সুদীপ মুখোপাধ্যায়ের 'চিঠি' কবিতার কয়েকটি পঙক্তি মনে পড়ে যায়, "তুমি আমার/ কষ্ট হয়ে/ বাড়ালে সুখ/ এত সুখের/ কষ্ট আমি/ কাকে জানাই"। নাট্যনির্মিতির জন্য একদিন দু'দিন শ্রম বা নিষ্ঠা দিলেই হয় না, আজীবন সাধনার মধ্য দিয়ে তৈরি হয় একটি সফল নাট্য। সফলতার মাপকাঠি কী তা নিয়ে অনেক বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু একটি বিষয় অবিতর্কিত--- নাট্যমঞ্চের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত থাকেন তাঁরা নানা প্রতিবন্ধকতা এবং সুখকর কষ্টের মধ্য দিয়ে দিনযাপন করেন। সেই দিনযাপনের কতটুকুইবা আমরা জানতে পারি। ভাসা-ভাসা কিছু বিষয় আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় মাত্র।

(১)

নাট্যনির্মিতির প্রথম পর্বেই রয়েছে নাটক। লিখিত নাটক একসময় প্রয়োজন হ'ত না। মুখে মুখেই সবটুকু বানিয়ে অভিনয় করেছেন শিল্পিরা। লিখিত নাটক প্রসঙ্গে প্রথমেই নাটক নির্বাচনের প্রশ্ন ওঠে।

নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অসুবিধা, সাধারণ মানুষের কাছে আজও নাটকপাঠ সমাদর লাভ করেনি (সাধারণ মানুষের দিকে আঙুল দেখাবার আগে একটু নিজেদের দিকে ও লক্ষ্য রাখা দরকার। আমরাই বা নাটকপাঠে কতটা আগ্রহী?)(তুলনায় ছোটগল্প কবিতা উপন্যাস এবং প্রবন্ধ পাঠের অভ্যাস সাধারণ পাঠকের মধ্যে অনেক বেশি সহজলভ্য।

ফলে নাটক মানুষ দেখতে আসেন। নাটকপাঠের অভ্যাস দর্শক ও নির্মাতার মধ্যে একধরনের বোঝাপড়া তৈরি করে, আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলে, যা নির্মাতার কাজের সদিচ্ছাকে সমৃদ্ধ করে। তবে নাটকপাঠের অভ্যাসহীন দর্শকের ক্ষেত্রে সুবিধা যে নেই তা নয়, তাদেরকে কল্পনা রাজ্যে সহজে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়। আগে থেকে নাটকটি সম্পর্কে ধারণা না থাকার ফলে মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অনেক বেশি থাকে। এমন স্বাধীনতা কি কাম্য? প্রত্যেক নির্মাতাই চান ভালো দর্শক, যে দর্শক সংবেদনশীল, নাট্য ও নাটক সম্পর্কে পূর্ব থেকেই প্রাজ্ঞ, সেই দর্শক যিনি আমার ত্রুটি ধরিয়ে দেবেন, আমাকে সমৃদ্ধ করবেন, এগিয়ে দেবেন। কখনো কখনো ছোটগল্প বা উপন্যাস ইত্যাদির নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হলে সেখানে নাটকটির কথাবস্তু সম্পর্কে আগে থেকে জানা থাকলেও মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে নতুন নতুন মাত্রা দর্শকদের অভিনব ভাবজগতে পৌঁছে দেয়। 'তিতাস একটি নদীর নাম' 'তিস্তা পাড়ের বৃত্তান্ত' ইত্যাদি জনপ্রিয় উপন্যাসগুলি যখন মঞ্চে উপস্থাপন করা হয় তখন তার মাত্রা যায় বদলে। পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের বহু উপন্যাস নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাটকের সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্প উপন্যাসের নাট্যরূপ আজও বেশ ভালই জনপ্রিয়। সে ক্ষেত্রে নির্দেশক বা অভিনেতাদের একটা চ্যালেঞ্জ থাকে উপন্যাসকে উত্তীর্ণ ক'রে নতুন জগতে পৌঁছে দেবার। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাল্মাদিতা' কাহিনিটি প্রায় সব বাঙালি পাঠ করেছেন এবং একটি নিজস্ব কল্পনা জগৎ রচনা করেছেন এই কাহিনি নিয়ে, কিন্তু সেই কাহিনি যখন নান্দীকার মঞ্চস্থ করে তখন চিন্তা করতে হয়, বাঙালির এতদিনের লালিত কল্পনাকে কীভাবে উত্তীর্ণ করা যাবে। কীভাবে উসকে দেওয়া যাবে কাহিনিটি পাঠের মধুর স্মৃতিকে।

আবার একই নাটক যখন বহু মঞ্চে অভিনীত হয়, তখন পূর্বের প্রযোজনাকে উত্তীর্ণ করে যাওয়ার মানসিকতা পরবর্তী নাট্যদলটির থাকে। অবশ্য কোনো কোনো নাটক গ্রামে গঞ্জে প্রচুর পরিমাণে হলেও পরবর্তী নাট্যদলের ক্ষেত্রে সেইসব প্রযোজনা দেখা নাও থাকতে পারে, সে ক্ষেত্রে শিল্পি তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ, স্থান ও সময়ের কারণে স্বাভাবিক ভাবেই অভিনব হয়ে ওঠে নাট্যটির নির্মাণকলা। এ তো তাঁর নিজস্ব দর্শনের সঙ্গে নাটকের কথাবস্তু সংযুক্ত হয়ে নতুন একটি ভাবনার নির্মাণ, যা দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতায় আরো বেশি শিল্পসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এখানে আর একটি কথা বলে রাখা দরকার, নাটককার নাটক লিখে দেন; পরিচালক সেই নাটকটি দ্বিতীয়বার লেখেন, তাঁর মনের মতো ক'রে সাজিয়ে নেন। মহড়া চলাকালীন তৃতীয়বার লেখা হয়, মহড়া চলতে চলতে কত নতুন ভাবনা জন্ম নেয় নাটকটিকে কেন্দ্র করে, যার ফলে নাটকটির জন্মান্তর ঘটে বারবার।

ইতিপূর্বে জানিয়েছি নাট্যপাঠের অভ্যাসের কথা। অভ্যাসটি ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে বলে নাটক প্রকাশের ক্ষেত্রেও প্রকাশনাগুলির অনীহা বেশি পরিমাণে দেখা যায়। এর ফলে প্রচুর পরিমাণে ভালো নাটক থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। বিশেষ কয়েকটি প্রকাশনা সংস্থা নাটক প্রকাশ করেন এবং অবশ্যই সেই নাটকগুলি হয় বিখ্যাত নাটককারের রচিত নাটক। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, উত্তর প্রদেশ, বাংলাদেশ, বিহার, ঝারখণ্ড, এমনকি বিদেশেও বসে যে সকল বাঙালি নাটক লিখছেন তার হদিস আমরা কতটুকুই বা রাখি। সেই নাটকগুলি এক বা একাধিকবার মঞ্চস্থ হওয়ার পর নাটককার বা নাট্যদলের ট্রাঙ্কে অনাদরে পড়ে থাকে।

নাট্যদলগুলির নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। যেমন,—

১. মৌলিক নাটক। (ক) সমকালীন সমাজের প্রয়োজনে সমসাময়িক নাটককারের লেখা নাটক এবং (খ) পুরনো নাটক সমকালের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে করবার জন্য নির্বাচন করা হয়। ইফটা নাট্যদলের 'বুড়ো শালিক নট আউট' এমনই একটি নাটক। মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিখ্যাত প্রহসন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। নির্মাতা নতুনভাবে গড়ে তুলেছেন বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে।২. রূপান্তরিত নাটক (ক) হুবহু তর্জমা (খ) বাঙলার উপযোগী করে ভাবানুবাদ (গ) হুবহু তর্জমা, অথচ বাঙলার জীবনচর্চার সঙ্গে মিশিয়ে গড়ে তোলা (ঘ) কথাসাহিত্য বা অন্যান্য সাহিত্যের নাট্যরূপ।

৩. দলগত কারণেও নাটক নির্বাচিত হয়। (ক) দলের অভিনেতা অভিনেত্রীদের দক্ষতা ও অক্ষমতা একটি বিশেষ কারণ। কোন দলে অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে সঙ্গীত বা নৃত্যদক্ষ শিল্পি থাকলে তাদের দলের নাটকে সঙ্গীত ও নৃত্যের বাহুল্য দেখা যায়।যদিও নৃত্য ও সঙ্গীতবাহুল্য থাকা মানেই এই কারণটি তার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তা নয়। বিশেষ কোন নাটক মঞ্চস্থ করবার কথা ভাবলে, সেখানে সঙ্গীত বা নৃত্যের জন্য অন্য দল থেকে বা বাইরে থেকে শিল্পি আনা হয়। এসব ক্ষেত্রে সমবেত প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়।(খ) নারী-পুরুষের সংখ্যার অনুপাত নাটক-নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। একসময় পাড়ায় পাড়ায় গ্রামেগঞ্জে গড়ে ওঠা সখের নাট্যদলগুলিতে অভিনেত্রী পাওয়া যেত না বলে বহু নাটকের টাইটেল পেজেই লেখা থাকতো "নারী বর্জিত নাটক"। আবার পুরুষ বর্জিত নাটকও দেখা গেছে অর্থাৎ কোনো গার্লস কলেজ বা লেডিস হোস্টেলের উপযোগী করে নাটক রচনাও দুর্লভ ছিল না। এছাড়া যে সকল নাট্যদলে নারীর

সংখ্যা বেশি থাকে নাটকটি হয় নারীকেন্দ্রিক, আবার পুরুষের সংখ্যা বেশি থাকলে পুরুষকেন্দ্রিক নাটক নির্বাচন করা হয় দলে। (গ) শিল্পের যে শাখায় পরিচালক সর্বাধিক আগ্রহ বোধ করেন সেই শাখার প্রভাব নাট্যে বিশেষ ভাবে থাকে। বালুরঘাট নাট্যকর্মীর পরিচালক অমিত দাস জানান, তিনি নাটকে আলোর প্রয়োগ বেশি পছন্দ করেন। কেউবা মঞ্চপরিকল্পনার উপর জোর দেন, আবার কেউ মিউজিককে নানা ভাবে ব্যবহারের প্রচেষ্টা রাখেন নাট্যের ক্ষেত্রে।

(ঘ) কোন নাট্যদলের কর্ণধার বা পরিচালক স্বয়ং নাটককার হলে তাঁর রচিত নাটকই সেই দলে প্রযোজনা হয়ে থাকে। (ঙ) নাট্যদলের আর্থিক ক্ষমতাও নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। নাটকে অঙ্গসজ্জা মঞ্চব্যবস্থা আলোকভাবনার ইত্যাদি যখন খুব সাধারণ খরচে সম্ভব হয় কোন নাটকে, সেই নাটক আর্থিক ভাবে দুর্বল দলগুলি বেশি বেশি করে মঞ্চস্থ করে। স্পষ্টভাবে বলা যায়, আর্থিক সঙ্গতি কম থাকার কারণে বহু নাট্যদল ছোট নাটক পরিবেশন করে। এবং তারা যেহেতু কল শো ছাড়া নিজস্ব শো করবার ক্ষমতায় রাখে না সেহেতু নাট্যদলগুলি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবার জন্য প্রচেষ্টা পায়।

৪. মঞ্চের কারণে নাটক নির্বাচনের ভাবনা পাল্টে যায়। যেমন প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্য এক ধরনের নাটক, পথনাট্যের জন্য আর এক ধরনের নাটক, আবার অন্তরঙ্গ থিয়েটার হলে সেখানে ভিন্নমাত্রিক নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। তবে কোনো কোনো নাটক অন্তরঙ্গ থিয়েটারে যেমন, তেমনি প্রসেনিয়াম মঞ্চেও অভিনীত হতে দেখা গেছে। এমন উদাহরণ অনেক আছে। তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো বাদল সরকারের 'মিছিল'।

(২)

নাট্যে পৌঁছতে গেলে দ্বিতীয় উপাদান নাট্যদলের কুশীলব। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা আসেন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। যাঁদের অনেকের মনে থাকে সমাজ বদলের ভাবনা, আবার একই সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত কীভাবে হবেন তাঁরা? থিয়েটার করে জীবিকা অর্জন করা খুব কঠিন ব্যাপার। ফলে ভিন্ন একটি জীবিকা এবং সঙ্গে যুক্ত নাট্যে। জীবিকার জন্যে নাট্যে যথেষ্ট সময় দেওয়া সবার ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। কেউ কেউ নাট্যের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়কে ভালোবেসেই হোক বা জীবিকার প্রয়োজনেই হোক ধারাবাহিক চলচ্চিত্র ইত্যাদিতে যাবার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত যা ঘটে তা হ'ল নাট্যদলগুলি রক্তাল্পতা রোগে ভোগে। তবু এরই মধ্যে দল চলে। অতিথি হিসেবে কিংবা আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে বাইরের শিল্পীদের নিয়ে এসেও নানা প্রযোজনার চেষ্টা চলে। যে করেই হোক দলটিকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করা হয়। অভিনয়কে ভালোবাসা, দলের প্রতি একনিষ্ঠ থাকা এবং অভিনয়কে সাধনা হিসেবে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকা অর্জন, এইসব মিলিয়ে তাঁদের মধ্যে কখনো কখনো ক্লান্তি তো আসেই। আর সেই কারণেই নাট্যে চমক দেওয়ার চেষ্টা কিংবা নাট্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায়। নাট্যে পৌঁছানোর আগেই কেউ কেউ মঞ্চ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

বারবার নাট্যসাধনা শব্দবন্ধটি আমরা ব্যবহার করেছি, কিন্তু কী সেই নাট্য সাধনা, নাট্য সাধনা আর নাট্য প্রতিভা এই দুইয়ের সম্পর্ক কী--- এই নিয়ে নানা আলোচনা হতে পারে। তবে খুব সংক্ষেপে এ কথা সত্য, অনেকেই নাট্যপ্রতিভা নিয়ে জন্ম নেন, যারা খুব সহজে সৃষ্টি করতে পারেন অনবদ্য সমস্ত শিল্পকলা, কিন্তু নাট্যসাধনার সঙ্গে নাট্য প্রতিভার একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। নাট্যপ্রতিভা আবার সাধনার মধ্য দিয়ে উন্নত হয়ে ওঠে। অনেকের কাছে নাট্যপ্রতিভা গুরুত্ব পায় না। তাঁরা সাধনার মধ্য দিয়ে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারেন।

এর জন্য প্রয়োজন একই সঙ্গে গুরুবিদ্যা, দ্বিতীয়ত নিরন্তর চর্চা, তৃতীয়তঃ সব ছেড়ে কেবল প্রাণের দেবতাটিকে নাট্যশিল্প নিয়ে প্রশ্ন করা, আমি কতটা এগোতে পারলাম প্রতিদিন। আগের দিনের চেয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে পারলাম কতটা, তার হিসেবে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করা। এ তো গেল একক সাধনার প্রয়াস। এখন নাট্যদলগুলি অনেক কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালার মধ্য দিয়ে অনেক কিছুই আমাদের সঞ্চিত হয়। তারপর সেই কর্মশালা শেষ হলে সঞ্চিত ধন কখন যেন বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায় কেবলমাত্র চর্চার অভাবে। তাই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কর্মশালায় যোগদান করলেই হয় না, তাকে প্রতিনিয়ত জীবনের অঙ্গ করে তুলতে হয়।

নাট্য শিল্পে পৌঁছানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মঞ্চ। মঞ্চ বলতে একটি বিশেষ স্থানের কথাই আমরা বুঝি। সেই স্থানটি কোথায় এবং কেমন হবে। সাধারণভাবে যুগ যুগান্তর ধরে পথে-প্রান্তরে যে নাট্য অভিনীত হয়ে চলেছে তার দিকে লক্ষ্য রাখলে বোঝা যায় যে মানুষের সমান্তরাল ভূমিতে অভিনয় করতেই আমরা বেশি স্বচ্ছন্দ। আরও পরে প্রসেনিয়াম মঞ্চের আবির্ভাব। তবে তারও সময় অল্প দিনের নয়, ভরত মুনি নাট্যশাস্ত্রে মঞ্চপরিকল্পনার যে কথা বলেছেন তা থেকে বোঝা যায় এই ধারার মঞ্চ বিদেশ থেকে আমদানি নয়, আমরা স্বদেশেই লাভ করেছিলাম। ভরত মুনি তিন ধরনের মঞ্চ ব্যবস্থার কথা বলেছেন, বিকৃষ্ট, ত্র্যাস্র ও চতুরাস্র। এই তিন শ্রেণীর নাট্যমঞ্চ আবার পরিমাপ অনুযায়ী তিন ধরনের ছিল। চতুরাস্রর সর্বাধিক বড় মাপ ৬৪ x ৬৪ বর্গহাত, পরের দুটি মাপ ৩২ x ৩২ বর্গহাত, ১৬ x ১৬ বর্গহাত। বিকৃষ্ট মঞ্চের পরিমাপ একই ভাবে ১০৮ x ৬৪ বর্গহাত, পরের দুটি মাপ ৬৪ x ৩২ বর্গহাত, ৩২ x ১৬ বর্গহাত। ত্র্যাস্র ত্রিভুজ আকৃতির। এর প্রতিটি বাহুর মাপ ১০৮ হাত এবং পরবর্তী দুটি পরিমাপের ত্র্যাস্র হল ৬৪ ও ৩২ হাত। প্রতিটি থিয়েটারকে দু'ভাগে ভাগ করা হত। এক ভাগে অভিনয়ের ব্যাপারগুলি মিটতো, অন্য ভাগে দর্শক আসন ছিল। একথা স্বীকার করতেই হয় আমাদের দেশে এক দিক খোলা তিনদিক বন্ধ মঞ্চ, যাকে প্রসেনিয়াম থিয়েটার হিসেবে বর্তমানে বলা হয় তার অস্তিত্ব ছিল। পরবর্তীতে বাঙলায় সেই মঞ্চের কোনো হদিস না পেলেও আমরা বাঙলার নাটকের হদিস পেয়েছি। চর্যাপদে, 'বুদ্ধনাটক' অভিনয়ের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং নিশ্চয়ই কোন নাট্যমঞ্চ ছিল কিন্তু তার চেহারা কেমন ছিল, সে বিষয়ে কোনো তথ্য নেই। পথনাটকের ও অন্তরঙ্গ থিয়েটারের একটা ইতিহাস আমাদের বাঙলায় চলে আসছে। তার দৃষ্টান্ত চৈতন্যদেবের অভিনয়, নানা লোকনাট্য, কথকতা ইত্যাদির মধ্যে পাই। বাঙলাদেশে ইংরেজের সূত্রে থিয়েটারে যে পরিচয় ঘটলো সেখানেও কিন্তু কিছু কিছু নতুন ব্যাপার আমরা জানতে পেরেছি। নবীনচন্দ্র বসুর শ্যামবাজার সম্পর্কে জানা যায়, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দৃশ্যের অভিনয় হ'তো 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকটির।

এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যাতায়াতের পথ ছিল সুড়ঙ্গ। আরো অনেক পরে বিশ শতকে এসে প্রসেনিয়াম মঞ্চ অনেক বেশি গতি পায়। রিভলভিং স্টেজ পাই আমরা বিভিন্ন থিয়েটারে। রিভলভিং স্টেজের একটা সুবিধা হল দ্রুত দৃশ্য পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। একই সঙ্গে তিন চারটি দৃশ্য তৈরি হয়ে থাকে, যখন যে দৃশ্যটি প্রয়োজন পড়ে তখন সেটি খুব দ্রুত উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। সারকারিনা মঞ্চ অবশ্যই একটি নতুন ধরনের থিয়েটার ব্যবস্থা। সেখানে নিচ থেকে উপরে উঠে আসে স্টেজ। এবং সার্কাসের মতন চারদিকে দর্শকরা থাকেন। দর্শকদের মাঝখান থেকেই অভিনেতা অভিনেত্রীরা মঞ্চে পৌঁছন। সরকারিনার প্রতিষ্ঠাতা অমর ঘোষ ব্যক্তিগত আলাপে জানিয়েছেন, এই ধরনের মঞ্চে অভিনয় করার জন্য বিশেষ অভ্যাস দরকার হয়। বিশেষ দক্ষতা না থাকলে এই মঞ্চে অভিনয় করা সম্ভব নয়, তাই অমর ঘোষের প্রয়াণের পর ফলে নাট্যমঞ্চটি আর কারো হাতে সজীব রইলো না। সুতরাং নাটককে নাট্যে রূপান্তর করব ভাবলেই হয় না, মঞ্চকে ব্যবহার করতে জানতে হয়।

বাঙলায় ভালো মঞ্চ নেই বললেই চলে, হাতেগোনা কয়েকটি। কিন্তু সব নাট্যদল মঞ্চগুলিতে ঠাঁই পায় না। একাডেমি রবীন্দ্রসদন শিশিরমঞ্চ গিরিশ মঞ্চ এর বাইরে ভালো নাট্যমঞ্চের ব্যবস্থা কলকাতায় দুর্লভ। জেলাগুলিতে রবীন্দ্রভবন নামক এক ধরনের মঞ্চের অস্তিত্ব রয়েছে, সেগুলিকে সংরক্ষণ ও যত্নের অভাবে এত নিম্নমানের হয়ে উঠছে যে সেখানে প্রযোজনা করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। এমনও ঘটনা দেখা যায়, মঞ্চের অসুবিধার কারণে পূর্ব নির্ধারিত মঞ্চপরিকল্পনা বদলাতে হয়েছে কখনো কখনো। লাইট লাগানোর সমস্যা থেকে শুরু করে নানা জাতীয় প্রতিবন্ধকতা মঞ্চগুলিতে থাকে। তবু তো মঞ্চকে ব্যবহার করে ভালো নাট্যের সন্ধান আমরা পাই, সফল সুন্দর নাট্য উপহার দিয়েছে বহু নাট্যদল। শিশির ভাদুড়ী পরিচালিত 'শেষরক্ষা' নাটকের প্রযোজনাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে তিনি দর্শক আসনকেও নাট্যমঞ্চের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। এক নতুন ভাবনার সংযোগ ঘটিয়েছিলেন। পরবর্তীতে লিটিল থিয়েটার গ্রুপ প্রযোজিত উৎপল দত্ত পরিচালিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' মঞ্চকে নতুনভাবে ব্যবহার করার শিক্ষা দিয়ে যায় আমাদের। গন্ধর্ব পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (১৯৬৩ সাল) অজিতেশ বন্দোপাধ্যায় লেখেন "পিকচার ফ্রেম থেকে নাট্যশিল্পকে মুক্তি দেবার প্রচেষ্টা এবং চতুর্থ দেওয়ালকে অস্বীকার করে মঞ্চকে দর্শকদের মধ্যে প্রসারিত করে তাঁদের অভিনীত নাটকের অংশীদার করে তোলার প্রচেষ্টা এদেশেও আগে হয়েছে কিন্তু তাতে মঞ্চস্থাপত্যের ভূমিকা অনুপস্থিত ছিল। আলোচ্য নাটকটির

ক্ষেত্রে সেই ভূমিকা উপস্থিত।" নান্দীকার প্রযোজিত 'সোজনবাদিয়ার ঘাট' প্রযোজনায় সুন্দর ভাবে স্থাপত্যকে ব্যবহার করে মঞ্চকে দর্শকদের মধ্যে প্রসারিত করে দেওয়ার চেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে।

(৪)

নাট্যকলার আর একটি উপকরণ আলো। পথনাট্য দিনের আলো ও রাতে হ'লে পথবাতির আলোতেই অভিনয় সম্পন্ন হয়। অন্তরঙ্গ থিয়েটারে সাধারণ আলোকেই নানা শেডে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রসেনিয়াম মঞ্চে কৃত্রিম উপায়ে আগুনের দ্বারা আলো ব্যবহার করা হ'ত। মশাল ও প্রদীপ সেই আলোর উৎস ছিল। মঞ্চের সামনে প্রদীপগুলি জ্বালিয়ে নাট্যাভিনয় হ'ত বলে আজও "পাদপ্রদীপের আলো" কথাই প্রসেনিয়াম মঞ্চের ক্ষেত্রে আমরা পাই। পরবর্তীতে অবশ্য আলোর নানা কারুকার্য শুরু হয়। কেবল উপকরণ নয়, আলো একটি চরিত্র হয়ে ওঠে নাট্যের ক্ষেত্রে। ভোর দুপুর সন্ধ্যা রাত ইত্যাদি বোঝাতে যেমন আলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তেমনি জোনাল অ্যাক্টিং ফ্ল্যাশব্যাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে আলোর সহযোগিতা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। আবার চরিত্রের নানা কর্মকাণ্ডকে অর্থবহ করে তোলবার জন্য আলোর ব্যবহার হয়। আলোপ্রক্ষেপণ একটি চরিত্র বা ঘটনার অর্থ উদ্ভাসিতও করে তোলে। সতু সেন আলোর ব্যবহার করে বাঙলা নাট্যজগতে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাপস সেন কনিষ্ক সেন প্রমুখ নাট্যে আলোর বিপ্লব নিয়ে আসেন।

(৫)

কোনো কোনো পরিচালক মিউজিক বেশি দিতে পছন্দ করেন, কোনো পরিচালক এই ব্যাপারে অত্যন্ত সংযত। আবহসঙ্গীত বলতে যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীত উভয়কেই বোঝায়। বাঙালি গীতিপ্রাণ জাতি। তার শিরায় শিরায় সঙ্গীতমূর্ছনা। ফলে বাঙলা নাট্যে সঙ্গীতের ব্যবহার স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আবহমানকাল ধরে বাঙলা লোকনাট্যে সঙ্গীতের প্রাধান্য। কথকতাগুলিও সঙ্গীতের আকারে পরিবেশন করা হ'ত। বাঙলায় নাটক তো আসলে পালাগান। যাত্রার ক্ষেত্রেও সকলের যাত্রা শুনতে যান, দেখতে যাওয়ার পরিবর্তে। পরবর্তীতে কালে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলিও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের নাটককার সেলিম আল দীন জাতীয় নাট্যধারা নামক যে ভাবনার পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, সেখানে সংগীতের আকারে কথকতার ধর্মে নাট্য পরিবেশিত হয়েছে।

সঙ্গীতের ব্যবহার নাট্যকে প্রাণবন্ত করে তোলে। কোনো কোনো সঙ্গীত নির্দিষ্ট নাট্যটির বাইরেও বেশ প্রভাব ফেলে। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে 'নরকগুলজার' নাটকের বিখ্যাত গান 'কেউ কথা বোলনা কেউ শব্দ কোর না/ ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন...'। এই ধরনের বহু নাট্যের গান অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। নাট্যে সঙ্গীতের ব্যবহার ঘটনার অগ্রগতির জন্য, চরিত্রের অন্তর উন্মোচনের ক্ষেত্রে ও ড্রামাটিক রিলিফের প্রয়োজনে হয়েছে। এক সময় নাট্যে বিবেকের অবতারণা ছিল খুব বেশি। বিবেক চরিত্রটি গানের মধ্য দিয়ে ঘটনার ব্যাখ্যা যেমন করত, তেমনি চরিত্রগুলির ভিতরের কথাকেও বাইরে প্রকাশ করবার মাধ্যম হয়ে উঠেছিল বিবেকের সঙ্গীত।

যন্ত্রসঙ্গীত বলতে একদা ঢোল হারমোনিয়াম, খোল, বাঁশি, তবলা, খঞ্জনি ও পার্কাসনের ব্যবহার বেশি ছিল। পরবর্তীতে টেপ রেকর্ডার ব্যবহার ক রে নাটকে শব্দপ্রক্ষেপণ করা হয়েছে। কোনো কোনো নাটকে অবশ্য মঞ্চের মধ্যেই বাদ্যযন্ত্রগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে। এখন আধুনিক প্রযুক্তির জন্য ল্যাপটপে সাউন্ড সিস্টেমকে গ্রহণ করে তার মাধ্যমে শব্দপক্ষেপণ করা হয়ে থাকে।

(৬)

একটি চরিত্রকে চেনা যায় তার সাজসজ্জার মধ্য দিয়ে। যদিও অঙ্গন মঞ্চের নাট্য বা থার্ড থিয়েটার ফর্মের নাট্যের কোনো কোনো প্রযোজনায় দেখা গেছে একই ধরনের পোশাকে সব অভিনেতা-অভিনেত্রী। সেখানে একই শিল্পি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন বলেই পোশাক-পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়না। কিন্তু প্রথাগত নাট্যের ক্ষেত্রে প্রতিটি চরিত্র আলাদা আলাদা ভাবে সজ্জিত হয়েই মঞ্চে উপস্থিত হয়। এক সময় পোশাক নিয়ে কোন যত্নশীল মনোভাব নাটদলগুলির প্রযোজনাতে দেখা যেত না। যার ফলে সিরাজদৌল্লার পোশাক অনায়াসেই শিবাজী পরে ফেলতে পারত। সার্বিকভাবে এই চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি। তাঁর 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রযোজনার ক্ষেত্রে পোশাকের ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নশীল হয়ে উঠেছিলেন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে পোশাক ব্যবহার করে। সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অঙ্গসজ্জার ক্ষেত্রে তাঁরাও নির্ভরযোগ্য

ভাবনার পরিচয় রাখেন। নাট্যের চরিত্র ঘটনা স্থান এবং কাল অনুযায়ী পোশাক ব্যবহারের দিকে নজর দিয়েছিলেন তাঁরা।

চরিত্রের সাজসজ্জা নিয়ে আর একটি বিষয় মনে রাখা দরকার, কখনো কখনো একটি নাটকের দ্বৈত চরিত্রের কারণে কিম্বা ফ্লাশ ব্যাকের কারণে শিল্পিকে বারবার পোশাক বদল করতে হয়। সেক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সহজে বদলানো যায় এমন পোশাক শিল্পির জন্য নির্বাচন করা দরকার। পোশাক পরিবর্তনের সময় যেন বেশি না হয়। হলে দর্শকদের একঘেয়ে লাগতে পারে। মনে পড়ে মানিকতলা অক্ষ নাট্যদলের 'জুজু' নাটো দ্বৈত চরিত্রে অভিনয়কারী শিশু শিল্পী শ্রী ভোজ প্রথমে প্রবীণ জুজু এবং পরে কমবয়সী মা চরিত্রে অভিনয় করে। তাকে মা চরিত্রের জন্য আগে থেকেই শাড়ি পরানো থাকে, তার উপরে একটি কালো আলখাল্লা ধরনের পোশাক পরানো হয়, ফলে ভিতরের পোশাক দেখা যায় না। জুজুর মাথায় সাদা পরচুলা লাগানো হয়। কালো আলখাল্লা ও সাদা পরচুলায় তার মেকআপ মায়ের মেকআপের বিপরীত মেরুর হয়। সাদা পরচুলাটি খুলে মেয়েদের লম্বা কালো পরচুলা পড়াতে সময় লাগে ২০ সেকেন্ড, আর উপরের আলখাল্লা খুলতে সময় লাগে ১০ সেকেন্ড সব মিলিয়ে৩০-৪০ সেকেন্ডের মধ্যে দ্রুত পোশাক বদল হয়ে যায়। দর্শকদের একঘেয়েমি লাগেনা। এই ৪০ সেকেন্ড জুজুর সাঙ্গপাঙ্গরা খেলায় ভুলিয়ে রাখে দর্শকদের। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের 'সহানুভূতি' নাটকের অভিনয়ে অঙ্গসজ্জা শিল্পি সঞ্জয় পোদ্দার একটি অদ্ভুত পরিকল্পনা করেন। নাটকটিতে আছে, মঞ্চের মধ্যেই এক চাকরিপ্রার্থী বেকার ছেলে চোখে অ্যাসিড ঢেলে তার একটি চোখ নষ্ট করে দেয়। সঞ্জয় পোদ্দার সেই শিল্পীর ব্যাগে একটি স্পঞ্জের তৈরি অ্যাসিডে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার মতো একটি চোখ বানিয়ে গাম আঠা লাগিয়ে রেখে দেন। শিল্পি অ্যাসিড ঢালার সময় ওই চোখটি লাগিয়ে নেন তাঁর বাম চোখে, ফলে মঞ্চের মধ্যেই বীভৎস হয়ে ওঠে তাঁর চোখ। এক্ষেত্রে অবশ্য লাইটেরও একটা অবদান রয়েছে, রয়েছে শিল্পির বিশেষ দক্ষতা।

(৭)

এত কিছুর মেলবন্ধন যিনি ঘটন তিনিই তো নাট্যপরিচালক। এক সময় তাঁরা চিহ্নিত ছিলেন নাট্যশিক্ষক বা মাস্টার হিসেবে। তখন তাঁরা কেবল অভিনয় শেখাতেন। পরবর্তীতে সামগ্রিক ভাবনাকে নির্মাণ করবার প্রয়াসী হলেন যখন, তখনই তো তাঁরা হয়ে উঠলেন নাট্যপরিচালক, নাট্যনির্দেশক, নাট্যনির্মাতা বা প্রয়োগকর্তা। তাঁর ভাবনাতেই সম্পূর্ণ মালা গাঁথা সম্ভব হয়। যে যাঁর নিজস্ব দিক নিয়ে ব্যস্ত থাকেন যখন তখন পরিচালক সামগ্রিকভাবে ভাবেন নাট্যটি নিয়ে। তিনি ঋষিতুল্য। সমগ্র নাট্যের চেহারা অনেক আগেই ভেবে রাখেন। যা আমরা দেখি তা সমস্ত শিল্পির সামগ্রিক দক্ষতায় নির্মিত হলেও স্রষ্টা সে-ই নাট্যপরিচালক। নানা স্তর পেরিয়ে ব্যর্থতার নানা ধাপ এড়িয়ে, যন্ত্রণার নানা পাঁপড়ি খুলে তিনি পৌঁছে যান সফল নাট্যে, যে নাট্য দেখার পর আমাদের মনে অনুরণন চলে একদিন নয়, দু'দিন নয়, বহুদিন পর্যন্ত।

বাংলাদেশ ও নেপালের পরে এবার কোন দেশ? গণবিপ্লব কি রাষ্ট্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের অন্তিম পথ?

শেখ আশরাফ

রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণের দিশারী হলো দেশের সুনাগরিক। দেশপ্রেমিক যুবসমাজ মানবতার পরম হাতিয়ার। সচেতনশীল নাগরিকবৃন্দ দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাস্থ্য সাবলীলভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। গণতন্ত্রের পরম বিকাশে মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার রূপরেখা ঢেলে সাজানো হয়। গণবিদ্রোহ মূলত মানুষের অধিকার, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের দাবিতে সংঘটিত হয়। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে: বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। এর ফলে মানুষ রাষ্ট্র ও সমাজে নিজেদের ক্ষমতা ও মর্যাদা ফিরে পায়। গণবিদ্রোহের ফলে দেশের অভ্যন্তরে
স্বৈরশাসন ও অন্যায়ের অবসান হয় ইতিহাসের সমীকরণে। গণবিদ্রোহ শোষক, স্বৈরশাসক ও দুর্নীতিবাহী ক্ষমতার

বিরুদ্ধে জনগণের একটি বিশেষ প্রতিবাদ। এটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টি করে এবং সরকারকে দায়িত্বশীল ও ন্যায়পরায়ণ হতে বাধ্য করে। সামাজিক ন্যায় ও সমতার প্রতিস্থাপনে এবং বৈষম্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ একত্রিত হওয়ার পথ দেখায়। সাধারণ মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষার্থী–সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজে সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। গণবিদ্রোহ প্রায়ই সাংস্কৃতিক সচেতনতা ও জাতীয় পরিচয় উদ্দীপিত করে। ভাষা আন্দোলন বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উজ্জীবিত করেছে। গণবিদ্রোহের ইতিহাস প্রমাণ করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই, সাহস ও ঐক্য সমাজকে পরিবর্তনের পথে নিয়ে যায়।
এই জনসচেতনতা নতুন প্রজন্মকে ন্যায়পরায়ণ, দায়িত্বশীল ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।
আন্তর্জাতিক মানের রাষ্ট্রনেতা হিসাবে পরিগণিত মহাত্মা গান্ধী, নেলসন ম্যান্ডেলা, শেখ মুজিবুর রহমান প্রভৃতি নেতা দেখিয়েছেন, গণবিদ্রোহ শান্তিপূর্ণ ও নৈতিক দিক থেকে বিশ্বের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে। গণবিদ্রোহের সার্বিক প্রতিরূপ হলো সাহস, ঐক্য, ন্যায়, স্বাধীনতা ও সামাজিক জাগরণের প্রতীক। এটি শুধু শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, বরং দেশ ও জাতির উত্তরণের উজ্জ্বল পথ প্রদর্শন করে।

গণআন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের নিরিখে বলা হয় -- গণবিদ্রোহ হলো জনগণের এক বিশেষ ধরণের স্বতঃস্ফূর্ত ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ, যা মূলত অন্যায়, শোষণ ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়। এটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

ইতিহাসে গণআন্দোলনের কয়েকটি বিশেষ দিক শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় ও কৃষক বিদ্রোহ ও জনউপদ্রব করা যেতে পারে, মধ্যযুগীয় ঔপনিবেশিক যুগে (১৭৫৭- জনসাধারণ বিভিন্ন যেমন : পাবনা বিদ্রোহ শোষণ বন্ধের চেষ্টা। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যুগের ভাষা আন্দোলন অধিকার রক্ষার জন্য গণ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে আন্দোলন পরিমার্জিত মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১) – স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক গণসংগ্রাম।

প্রেক্ষাপটে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় যুগে পরিলক্ষিত হয়েছে -- প্রাচীন সমাজে জোরপূর্বক কর আদায়ের বিরুদ্ধে দেখা যায়। উদারহরণ হিসাবে উল্লেখ বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও নীলবিদ্রোহ। ১৯৪৭) ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন পরিচালনা করেছিল। (১৮৭৩-৭৬) – জমিদারের অন্যায় বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন (১৯০৫) – স্বাতন্ত্র্যের জন্য। স্বাধীনতা ও আধুনিক (১৯৫২) – বাংলার মানুষের সাংস্কৃতিক আন্দোলন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। – স্বৈরশাসনের পতন এবং গণতান্ত্রিক হয়েছিল।

সমসাময়িক যুগে, আরব বসন্ত (২০১০-১১), লাতিন আমেরিকার গণআন্দোলন ইত্যাদি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও গণআন্দোলনের উদাহরণ দেখা যায়। সামাজিক মাধ্যম ও প্রযুক্তির ব্যবহার, শান্তিপূর্ণ ও সহিংস উভয় আন্দোলন গণবিদ্রোহের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে।
গণ বিদ্রোহের মূল কারণসমূহ বিশ্লেষণ করলে বিশেষ কয়েকটা বিষয় খুব স্বাভাবিকভাবে উপস্থাপিত হয়। সে সবের মধ্য অন্যতম হলো: অন্যায় ও শোষণ – অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক, স্বৈরশাসন ও ক্ষমতার অপব্যবহার, অধিকার ও স্বাধীনতার লঙ্ঘন, সামাজিক সচেতনতা ও সাংস্কৃতিক ঐক্য যা আন্দোলনকে নিবিড়ভাবে শক্তিশালী করে তোলে। গণআন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট প্রমাণ করে–মানুষ সর্বদা অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত থাকে। এটি কেবল রাজনৈতিক পরিবর্তনের হাতিয়ার নয়, বরং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সচেতনতা, ন্যায় ও গণতন্ত্রের শক্তিশালী রক্ষক হিসেবেও কাজ করে।

রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে গণআন্দোলনের উত্তরণে যে বিশেষ প্রেক্ষাপটগুলি ত্বরান্বিত করেছিলো সেগুলি হলো: রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট-- গণআন্দোলন প্রায়শই রাজনৈতিক অবস্থা ও শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত।

Sahityasena, a research and Creative literature oriented E-journal. Published by Farjina Parvin and edited by Sariful Islam. WhatsApp - 8617377896, Email - sahityasena@gmail.com, Website - sahityasena.com

প্রধান দিকগুলো হলো– স্বৈরশাসন ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। যেখানে শাসকগোষ্ঠী বা সরকার জনগণের প্রতি দায়িত্বহীন বা অত্যাচারী, সেখানে গণআন্দোলন সংঘটিত হয়।উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে-- ১৯৯০ সালের বাংলাদেশে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন। রাজনৈতিক বৈষম্য ও শোষণ-- সংখ্যালঘু ও দরিদ্র জনগণের রাজনৈতিক অধিকার হরণ বা সীমিত করা হলে জনবিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা-- উপনিবেশিক শাসন বা বিদেশি প্রভাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন রাজনৈতিক গণআন্দোলনের প্রধান কারণ। যেমন: ভারত ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন।সংবিধান ও আইনের লঙ্ঘন-- সরকারের আইন ও সংবিধান অমান্য করলে জনগণকে আন্দোলনে যুক্ত হতে হয়।

সামাজিক প্রেক্ষাপট গণ বিদ্রোহে আলাদা জীবন সঞ্চার করেছিলো-- গণআন্দোলন শুধু রাজনৈতিক নয়, সামাজিক কারণেও সংঘটিত হয়। যেমন : অর্থনৈতিক বৈষম্য ও দারিদ্র্য : সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য জনগণকে একত্রিত করে। নীলবিদ্রোহে কৃষক ও শ্রমিকরা জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। সংস্কৃতি ও পরিচয়: ভাষা, ধর্ম বা জাতিগত পরিচয়ের উপর আঘাত সামাজিক প্রতিরোধকে উৎসাহিত করে। ভাষা আন্দোলন (১৯৫২) – বাংলার মানুষের সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষার জন্য। শোষণ ও অন্যায়: সমাজের দুর্বল ও নিপীড়িত জনগণ সাধারণত আন্দোলনের কেন্দ্রে থাকে। শিক্ষিত ও সচেতন মানুষ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়।সামাজিক সচেতনতা: শিক্ষার প্রসার, সংবাদমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন জনগণকে আন্দোলনে অংশগ্রহণে সক্ষম করে। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট মিলেই গণআন্দোলন জন্ম নেয়।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট: স্বৈরশাসন, অধিকারহীনতা, সংবিধান লঙ্ঘন।

সামাজিক প্রেক্ষাপট: বৈষম্য, দারিদ্র্য, সাংস্কৃতিক-জাতিগত অবিচার। অর্থাৎ, গণআন্দোলন কেবল রাজনৈতিক প্রতিবাদ নয়, বরং সমাজের সচেতনতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

গণবিপ্লব বলতে বোঝায়–

জনগণের সম্মিলিত শক্তি, অসন্তোষ ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র বা সমাজব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আনার প্রক্রিয়া। এটি মূলত সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সংঘটিত হয়।

গণবিপ্লবের বৈশিষ্ট্য: জনসাধারণের অংশগ্রহণ – একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি নয়, বরং কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত-সমাজের নানা স্তরের মানুষ এতে যুক্ত হয়।অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ – অন্যায় শাসন, শোষণ, বৈষম্য, দমন-পীড়ন বা অমানবিক পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে গণবিপ্লব ঘটে।প্রচণ্ড গণআন্দোলন – এটি সাধারণত ধর্মঘট, মিছিল, আন্দোলন, কখনো সশস্ত্র বিদ্রোহ আকারে বিস্তার লাভ করে। ব্যবস্থার পরিবর্তন – গণবিপ্লবের লক্ষ্য শুধু ক্ষণিক প্রতিবাদ নয়, বরং রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় মৌলিক পরিবর্তন আনা। নেতৃত্ব ও ঐক্য – শক্তিশালী নেতৃত্ব, সংগঠন এবং জনগণের ঐক্য গণবিপ্লব সফল হওয়ার মূল শর্ত।

ইতিহাসের কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো: ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) – রাজতন্ত্র উৎখাত করে জনগণ নতুন সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলে। রুশ বিপ্লব (১৯১৭) – শ্রমিক ও কৃষকের নেতৃত্বে জারতন্ত্রের পতন ঘটে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও গণআন্দোলনের ধারা ছিল গণবিপ্লবের এক রূপ। গণবিপ্লব হলো জনগণের শক্তির এমন এক অগ্ন্যুত্পাত, যা অন্যায় ও শোষণের শৃঙ্খল ভেঙে নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ রচনা করে।

অবিভক্ত বাংলায় গণবিদ্রোহ: বাংলার ইতিহাসেও গণবিপ্লব বা জনআন্দোলনের একাধিক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। এগুলো শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তনই আনেনি, বরং সাধারণ মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলায় গণবিপ্লবের উদাহরণ:

নীলবিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০)

ইংরেজ নীলকররা কৃষকদের জোরপূর্বক নীলচাষে বাধ্য করত। কৃষকরা নীলচাষ বন্ধ করতে গণআন্দোলন শুরু করে। এ বিদ্রোহে কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল, যা গণবিপ্লবের প্রথম দৃষ্টান্তগুলোর একটি।

পাবনা বিদ্রোহ (১৮৭৩-৭৬): জমিদারদের অন্যায় খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে কৃষকরা সংগঠিত হন। "পাবনা কৃষক লীগ" গড়ে তোলা হয়। এ আন্দোলনে হাজার হাজার কৃষক যোগ দেন, যা ব্রিটিশ শাসনকে কাঁপিয়ে তোলে।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন

ব্রিটিশরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বাংলা ভাগ করেছিল। এর প্রতিবাদে সমগ্র বাংলায় হরতাল, মিছিল, গান্ধেমুখী

প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক থেকে শুরু করে সব শ্রেণির মানুষ এতে যুক্ত হয়।
১৯৪৬ সালের তেভাগা আন্দোলন শস্য ভাগাভাগির অন্যায় নিয়মে (অর্ধেক জমিদারকে দিতে হতো) কৃষকরা ক্ষুব্ধ ছিলেন। কৃষকেরা দাবি করেন– "তিনভাগের দুইভাগ শস্য কৃষকের থাকবে"।লাখো কৃষক এতে যোগ দেন, যা গণবিপ্লবের অন্যতম নিদর্শন।
ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৫২): পাকিস্তান সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করে উর্দু চাপিয়ে দিতে চাইলে বাংলার ছাত্র-জনতা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রক্ত ঝরিয়েও বাংলার মানুষ তাদের মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। এটি ছিল জনগণের আত্মত্যাগ ও ঐক্যের এক মহান গণবিপ্লব।
১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান: আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাস্তায় নামে। কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত সবাই এ আন্দোলনে অংশ নেন। আইয়ুব খানকে পতন স্বীকার করতে হয়।
১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ: বাঙালির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল। ১৯৭১ সালে সমগ্র জাতি মুক্তির জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এটি ছিল বাংলার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ গণবিপ্লব, যার ফলে স্বাধীন বাংলাদেশ জন্ম নেয়। বাংলার ইতিহাসে গণবিপ্লব কখনো কৃষকের ন্যায্য অধিকার আদায়ে, কখনো ভাষা রক্ষায়, আবার কখনো জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংঘটিত হয়েছে। এগুলো প্রমাণ করে-জনগণের ঐক্যই অন্যায় ও শোষণ ভাঙার সবচেয়ে বড় শক্তি।

আন্তর্জাতিক মানের গণবিপ্লব বলতে বোঝায়– শুধু একটি রাষ্ট্রের ভেতরে সীমাবদ্ধ নয়, বরং যার প্রভাব গোটা বিশ্বে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় পরিবর্তনের ধারা সৃষ্টি করেছে। এ ধরনের গণবিপ্লব মানবসভ্যতার গতিপথ পাল্টে দিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে।
আন্তর্জাতিক মানের প্রধান গণবিপ্লব:
ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯): রাজতন্ত্রের অবিচার, সামন্তব্যবস্থা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, করের বোঝা। সাধারণ মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত সবাই এতে যোগ দেয়।বিদ্রোহের ফলে রাজতন্ত্রের পতন, "স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব" নীতির উত্থান।
আন্তর্জাতিক প্রভাব: ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অনুপ্রেরণা দেয়।
আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৭৭৬): ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, করনীতি, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। উপনিবেশের সাধারণ জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে যুক্ত হয়। ফলাফল হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হয়। আন্তর্জাতিক প্রভাবের ফলে উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনের পথিকৃৎ হয়ে ওঠে।
রুশ বিপ্লব (১৯১৭): জারতন্ত্রের শোষণ, যুদ্ধজনিত দুর্দশা, কৃষক-শ্রমিকের অধিকারহীনতা। শ্রমিক ও কৃষক সমাজতান্ত্রিক আদর্শে সংগঠিত হয়।
ফলাফল: জারতন্ত্র পতন, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। আন্তর্জাতিক প্রভাব: বিশ্বজুড়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের উত্থান, ঠান্ডা যুদ্ধ পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার।
চীনের গণবিপ্লব (১৯৪৯): সামন্তবাদ, বিদেশি শোষণ, সামাজিক বৈষম্য। কৃষক ও শ্রমিকদের গণসংগ্রাম, মাও সে তুং-এর নেতৃত্বের ফলে চীনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। আন্তর্জাতিক প্রভাবের ফসল হিসাবে পাওয়া যায় এশিয়ার বহু দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের অনুপ্রেরণা।
কিউবার বিপ্লব (১৯৫৯): মার্কিন প্রভাবাধীন দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার, দারিদ্র্য ও বৈষম্য।ফিদেল কাস্ত্রো ও চে গুয়েভারার নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়। ফলস্বরূপ বাতিস্তা সরকার পতন, সমাজতান্ত্রিক কিউবার প্রতিষ্ঠা। আন্তর্জাতিক প্রভাবে মেলে লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনে দৃষ্টান্ত।
আরব বসন্ত (২০১০-২০১১: স্বৈরতন্ত্র, বেকারত্ব, দুর্নীতি, সামাজিক অবিচার।আধুনিক কালের অন্যতম গণবিপ্লব, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যাপক ব্যবহার। আন্দোলনের ফসল হিসাবে পাওয়া যায় তিউনিসিয়া, মিশর, লিবিয়া প্রভৃতি দেশে সরকার পতন। আন্তর্জাতিক প্রভাবের ফলে সৃষ্টি হয় বিশ্বে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নতুন অধ্যায়।
বৈশ্বিক গণবিপ্লবের বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরা হলো: জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোয় মৌলিক পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক অনুপ্রেরণা ও প্রভাব, দমন-পীড়ন সত্ত্বেও টিকে থাকা ঐক্য, এক রাষ্ট্র

থেকে অন্য রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা। আন্তর্জাতিক মানের গণবিপ্লব শুধু একটি রাষ্ট্রকে বদলায় না; বরং গোটা বিশ্বের রাজনৈতিক দর্শন, সামাজিক চিন্তাধারা ও স্বাধীনতার ধারণাকে পুনর্গঠন করে।

গণবিদ্রোহের পূর্বস্তর হলো শোষণ ও শোষক : গণবিপ্লব মূলত শোষণ ও শোষকের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ। কেন এমন বলা যায়?

১. শোষণের অভিজ্ঞতা: যখন কোনো শাসকগোষ্ঠী, জমিদার, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বা ক্ষমতাধর শ্রেণি জনগণের ওপর অবিচার, বৈষম্য ও অর্থনৈতিক শোষণ চালায়–তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ জমতে থাকে।

২. অধিকার বঞ্চনা: খাদ্য, ভূমি, শিক্ষা, ভাষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে জনগণ বিদ্রোহে ফেটে পড়ে।

৩. জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ: গণবিপ্লবের মূলে থাকে সাধারণ মানুষের সম্মিলিত শক্তি। তারা সংখ্যায় বেশি হলেও দীর্ঘদিন নীরব থাকে; কিন্তু শোষণ অসহনীয় হলে একসাথে দাঁড়িয়ে যায়।

৪. শোষকের পতন: গণবিপ্লব কেবল প্রতিবাদ নয়, বরং শোষণ ও শোষকের আধিপত্য ভেঙে নতুন ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।

দু -একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়

নীলবিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০, বাংলা): কৃষকরা নীলকর শোষকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল।

ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯): দরিদ্র জনগণ অভিজাত ও রাজতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

রুশ বিপ্লব (১৯১৭): শ্রমিক ও কৃষক জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল।

তাই বলা যায়, গণবিপ্লব হলো শোষণ, বঞ্চনা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ এবং নতুন ন্যায়সংগত সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস।

যে দেশে যত বেশি গণবিপ্লব, সে দেশ তত বেশি কি উত্তরণের উত্তরাধিকারী?

মানবসভ্যতার ইতিহাসে গণবিপ্লব এক অনন্য ঘটনা। এটি সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে শোষণ, বৈষম্য ও দমননীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে মৌলিক পরিবর্তন আনে। ইতিহাসে দেখা যায়, যেসব দেশে গণবিপ্লব ঘটেছে, সেখানে রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোয় নতুন ধারা সৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রশ্ন হলো– "যে দেশে যত বেশি গণবিপ্লব, সে দেশ ততো বেশি কি উত্তরণের উত্তরাধিকারী?" এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক বিশ্লেষণ করতে হবে।

ইতিবাচক দিক:

১. নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম:

ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) রাজতন্ত্রকে উৎখাত করে আধুনিক গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পথ সুগম করে।

মার্কিন স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৭৭৬) নতুন রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা ও স্বশাসনের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

২. জাতীয় মুক্তি ও আত্মপরিচয়: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১) ছিল বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ গণবিপ্লব, যা স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দেয় এবং রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক উত্তরণের নতুন ধারা তৈরি করে।

৩. সামাজিক পরিবর্তন: রুশ বিপ্লব (১৯১৭) শ্রমিক ও কৃষকের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বীজ বপন করে।

এসব উদাহরণ প্রমাণ করে যে, গণবিপ্লব একটি জাতিকে উত্তরণের উত্তরাধিকারী করতে পারে।

নেতিবাচক দিক:

১. অস্থিরতা ও বিভ্রান্তি: লাতিন আমেরিকার বহু দেশে একের পর এক গণঅভ্যুত্থান ঘটলেও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসেনি। দারিদ্র্য, দুর্নীতি ও সামরিক শাসন সেখানে অব্যাহত থেকেছে।

২. অপূর্ণ বিপ্লব: আরব বসন্ত (২০১১)-এর সময় তিউনিসিয়া, মিশর, লিবিয়া প্রভৃতি দেশে স্বৈরতন্ত্র পতন ঘটলেও স্থায়ী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়নি। বরং কোথাও গৃহযুদ্ধ, কোথাও আবার নতুন স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ, বিপ্লব যদি সুসংগঠিত নেতৃত্ব ও সঠিক আদর্শে পরিচালিত না হয়, তবে তা উত্তরণ নয়, বরং অস্থিরতার জন্ম দেয়। গণবিপ্লব কেবল ঘটলেই উত্তরণ আসবে–এটি একেবারে নিশ্চিত নয়।

প্রকৃত উত্তরণের জন্য প্রয়োজন–সঠিক নেতৃত্ব, জনগণের ঐক্য, ন্যায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা।

এই শর্তগুলো পূরণ হলে গণবিপ্লব উত্তরণের উত্তরাধিকার তৈরি করে। যে দেশে যত বেশি গণবিপ্লব ঘটে, সে দেশ ততো বেশি উত্তরণের উত্তরাধিকারী হয়, যদি সেই বিপ্লবগুলো আদর্শভিত্তিক, সংগঠিত ও স্থায়ী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। অন্যথায়, ঘন ঘন গণবিপ্লব কেবল অস্থিরতার জন্ম দেয়, উত্তরণের নয়। তাই গণবিপ্লবের প্রকৃত মূল্য নিহিত থাকে তার লক্ষ্য, নেতৃত্ব ও অর্জনে।

বর্তমান অস্থিরতা দূরীকরণের জন্য গণবিপ্লব একমাত্র পথ নয়। গণবিপ্লব বড় পরিবর্তন আনার শক্তিশালী হাতিয়ার হলেও এটি সবসময় চূড়ান্ত সমাধান নয়। সমাজ বা রাষ্ট্রের অস্থিরতা মোকাবিলায় আরও নানা উপায় রয়েছে।কেন গণবিপ্লব সবসময় একমাত্র পথ নয়?

১. রক্তপাত ও ধ্বংসের ঝুঁকি: গণবিপ্লব প্রায়শই সহিংসতা, প্রাণহানি ও অর্থনৈতিক ক্ষতি ডেকে আনে। অনেক সময় বিপ্লব সফল হলেও দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীলতা আনে না (যেমন আরব বসন্তের পর অনেক দেশে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়)।

২. প্রাতিষ্ঠানিক সমাধানের সুযোগ: গণতান্ত্রিক কাঠামো, সংলাপ, আইনের শাসন, ন্যায্য নির্বাচন ও নীতি-সংস্কারের মাধ্যমে অস্থিরতা সমাধান সম্ভব।শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনও পরিবর্তনের কার্যকর পথ হতে পারে।

৩. সংস্কার ও নীতিগত পরিবর্তন: শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সামাজিক ন্যায়বিচার, বৈষম্য হ্রাস ইত্যাদি নীতি গ্রহণের মাধ্যমে অস্থিরতা কমানো যায়। সংস্কারকামী নেতৃত্ব অনেক সময় বিপ্লব ছাড়াই স্থায়ী উন্নয়ন ঘটাতে পারে (যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলার শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন)।

৪. জনগণের ঐক্য ও সচেতনতা: গণবিপ্লব ছাড়া জনগণের সাংস্কৃতিক জাগরণ, সামাজিক আন্দোলন, নাগরিক উদ্যোগও সমাজকে পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে নিতে পারে।

কখন গণবিপ্লব প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে?

যখন রাষ্ট্র কাঠামো একেবারেই অচল হয়ে যায়। যখন সংলাপ, গণতান্ত্রিক পথ ও নীতিগত সংস্কার সব ব্যর্থ হয়। যখন শোষণ ও দমন-পীড়ন এতটাই অসহনীয় হয় যে জনগণের আর কোনো বিকল্প থাকে না।গণবিপ্লব অস্থিরতা দূরীকরণের একটি শক্তিশালী পথ হলেও একমাত্র পথ নয়। বরং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য প্রয়োজন– গণতান্ত্রিক চর্চা, আইনের শাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার, সংস্কার ও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ। তাই বলা যায়, গণবিপ্লব তখনই প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, যখন সব শান্তিপূর্ণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সমাধান ব্যর্থ হয়।

দেশের অভ্যন্তরে ভ্রষ্টাচার বনাম গণআন্দোলন: ভ্রষ্টাচার (Corruption) হলো রাষ্ট্র ও সমাজের অন্যতম প্রধান ব্যাধি। এটি অর্থনীতি, রাজনীতি ও ন্যায়বিচারকে দুর্বল করে দেয়। অন্যদিকে, গণআন্দোলন হলো জনগণের সম্মিলিত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ, যা ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে কাজ করে। ফলে দেশের অভ্যন্তরে ভ্রষ্টাচার ও গণআন্দোলনের মধ্যে এক বিরোধী সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ভ্রষ্টাচারের প্রভাবে-- ১. অর্থনৈতিক ক্ষতি – সরকারি সম্পদ লুণ্ঠন ও ঘুষ অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ায়। ২. সামাজিক অবক্ষয় – মেধা ও যোগ্যতার বদলে ঘুষ ও সুপারিশ প্রাধান্য পায়। ৩. রাজনৈতিক অস্থিরতা – ভ্রষ্ট নেতারা রাষ্ট্রযন্ত্রকে জনগণের পরিবর্তে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করে। ৪. জনগণের আস্থা হারানো – নাগরিকরা রাষ্ট্রের প্রতি অনাস্থাশীল হয়ে পড়ে।

গণআন্দোলনের ভূমিকা:

১. সচেতনতা সৃষ্টি – দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করে। ২. অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্য – ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির মানুষ একত্রিত হয়। ৩. প্রশাসনের জবাবদিহিতা – আন্দোলনের চাপ প্রশাসনকে দায়িত্বশীল হতে বাধ্য করে।৪. সংস্কার ও পরিবর্তন – গণআন্দোলনের ফলে আইন, নীতি ও নেতৃত্বে পরিবর্তন আসে।

ভ্রষ্টাচার বনাম গণআন্দোলন: বিরোধী শক্তি

ভ্রষ্টাচার অন্ধকার, অন্যায় ও স্বজনপ্রীতির প্রতীক। গণআন্দোলন হলো আলো, ন্যায় ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ। যেখানে ভ্রষ্টাচার বেড়ে যায়, সেখানে গণআন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্ম নেয়। তবে গণআন্দোলন

যদি সুসংগঠিত না হয়, তবে ভ্রষ্টাচার নতুন রূপে ফিরে আসতে পারে।দেশের অভ্যন্তরে ভ্রষ্টাচার সমাজকে পেছনে ঠেলে দেয়, আর গণআন্দোলন সেই শৃঙ্খল ভেঙে জনগণকে উত্তরণের পথে এগিয়ে দেয়। সুতরাং বলা যায়– ভ্রষ্টাচার ও গণআন্দোলন একে অপরের বিপরীত শক্তি; ভ্রষ্টাচার অন্ধকারের প্রতীক, আর গণআন্দোলন আলোকিত সমাজের অগ্রযাত্রা।

বাংলাদেশ ও নেপালের ঢেউ কি অন্য দেশে পড়তে পারে?

বাংলাদেশ ও নেপাল–দুটি দেশই দীর্ঘদিন নানা সংকট, দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও শোষণের অভিজ্ঞতা পেরিয়ে জনগণের আন্দোলনের মাধ্যমে নতুন পথ দেখিয়েছে। তাই প্রশ্ন আসে, এই দেশগুলোর অভিজ্ঞতা কি দুর্নীতিগ্রস্ত অন্যান্য দেশে। উত্তরণের পথ প্রশস্ত করতে পারে?

১. বাংলাদেশ যে পথ দেখিয়েছে-- ভাষা আন্দোলন (১৯৫২): সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত অধিকারের জন্য জনগণের ত্যাগ।

গণঅভ্যুত্থান (১৯৬৯): স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ।

মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১): স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম, জনগণের আত্মনির্ভরতার প্রতীক।

গণআন্দোলন (১৯৯০): সামরিক স্বৈরশাসন পতন, গণতান্ত্রিক ধারার পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

শিক্ষা: জনগণের ঐক্য, সাংস্কৃতিক সচেতনতা, আত্মত্যাগ ও ধারাবাহিক আন্দোলন দুর্নীতিগ্রস্ত বা দমনমূলক শাসন ভাঙতে পারে।

২. নেপাল যে পথ দেখিয়েছে

জনআন্দোলন (১৯৯০): রাজতন্ত্রকে সাংবিধানিক রূপে সীমিত করা হয়।

দ্বিতীয় জনআন্দোলন (২০০৬): সর্বাত্মক গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে শতাব্দীপ্রাচীন রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা: নেপাল একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়। শিক্ষা: দুর্নীতিগ্রস্ত, অকার্যকর ও স্বৈরতান্ত্রিক কাঠামোকে জনগণের সম্মিলিত শক্তি উল্টে দিতে পারে।

৩. এই অভিজ্ঞতা থেকে অন্যান্য দেশের জন্য শিক্ষা: দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণঐক্য গড়ে তোলা – বাংলাদেশ ও নেপাল দেখিয়েছে, একক নেতার ওপর নির্ভর না করে সাধারণ মানুষের সম্মিলিত শক্তিই পরিবর্তনের চাবিকাঠি। সংস্কৃতির শক্তি – ভাষা, সংস্কৃতি, ঐক্যের প্রতীক মানুষকে সহজে একত্রিত করে। অটল নেতৃত্ব ও আদর্শ – সুসংগঠিত নেতৃত্ব আন্দোলনকে স্থায়ী রূপ দেয়।

সংবিধান ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন – শুধু সরকার পতন নয়, ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই আসল সাফল্য।

৪. সীমাবদ্ধতা: বাংলাদেশ ও নেপাল এখনও দুর্নীতি ও রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়নি। তাই তাদের পথ অনুপ্রেরণা দিতে পারে, কিন্তু যাদুমন্ত্রের মতো সমাধান নয়।

প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট আলাদা; তাই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজস্ব বাস্তবতার সাথে মানিয়ে নিতে হবে।

বাংলাদেশ ও নেপালের আন্দোলন প্রমাণ করেছে–দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে জনগণের ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে উত্তরণের পথ তৈরি করা যায়। তবে এই অভিজ্ঞতাকে অন্ধভাবে অনুকরণ নয়; বরং শিক্ষা নিয়ে প্রতিটি দেশকে নিজস্ব বাস্তবতায় প্রয়োগ করতে হবে।

নিবিড় গণআন্দোলন কি ভীষণ জরুরী?

নিবিড় গণবিদ্রোহ ছাড়া অপশাসনের দেশকে রক্ষা করা সম্ভব, কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি এবং সুসংগঠিত পদক্ষেপ।

১. গণতান্ত্রিক কাঠামো শক্ত করা:

স্বচ্ছ ও ন্যায়ভিত্তিক নির্বাচন: ক্ষমতায় আসা সরকার জনগণের আস্থা অর্জন করে।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা: আইন সব নাগরিকের জন্য সমানভাবে কার্যকর হলে অপশাসন স্বাভাবিকভাবে কমে।

বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা: দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আসে।

২. প্রশাসনিক সংস্কার: দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তা: যোগ্য ও সততা-নিষ্ঠ কর্মকর্তাদের নিয়োগ। দূর্নীতি ও

অপব্যবস্থা রোধ: সরকারি সম্পদ, রাজস্ব ও নীতিমালা স্বচ্ছভাবে পরিচালনা।
পরিচালনায় প্রযুক্তি ব্যবহার: ই-গভর্নেন্স ও ডিজিটাল সিস্টেম দুর্নীতি হ্রাসে সাহায্য করে।
৩. সমাজ ও শিক্ষা: শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি: নাগরিকরা অপশাসনের বিরুদ্ধে জানাশোনা থাকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। সামাজিক আন্দোলন ও পরিবীক্ষণ: গণমাধ্যম, এনজিও ও নাগরিক সংগঠন সরকারের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে স্বচ্ছতা বজায় রাখে।নাগরিক অংশগ্রহণ: জনগণ রাজনীতি, সামাজিক নীতি ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশ নিলে অপশাসনের সুযোগ কমে।
৪. শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ও পদ্ধতিগত চাপ:
শান্তিমূলক ও আইনগত প্রক্রিয়া: দুর্নীতিবিরোধী আইন প্রয়োগ, অবৈধ কর্মকাণ্ডের শাস্তি। মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা: জনগণ সচেতন থাকে এবং শোষকরা চাপে পড়ে।হরতাল, মিছিল বা প্রাইভেট আন্দোলন: সহিংসতা নয়, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ অপশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।
নিবিড় গণবিদ্রোহ ছাড়া অপশাসনের দেশকে রক্ষা করা সম্ভব যদি:
১. শক্তিশালী গণতান্ত্রিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়, ২. প্রশাসন স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ হয়, ৩. সমাজ সচেতন ও অংশগ্রহণমূলক হয়, ৪. আইন ও নীতি কার্যকরভাবে প্রয়োগ হয়। শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, স্বচ্ছ প্রশাসন ও সক্রিয় নাগরিক সমাজই অপশাসনের বিরুদ্ধে দেশকে রক্ষা করার শান্তিপূর্ণ ও কার্যকর উপায়। একটি গণআন্দোলনের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে আন্দোলনকারীদের করণীয় ও অকরণীয়-এর উপর।
আন্দোলনকারীদের করণীয়:
১. ঐক্য বজায় রাখা – ব্যক্তিগত স্বার্থ বাদ দিয়ে যৌথ লক্ষ্য সামনে রাখা।
২. শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ – অহিংস উপায়ে আন্দোলন জনসমর্থন বাড়ায়।
৩. সুস্পষ্ট দাবি উপস্থাপন – জনগণের কাছে সহজ ভাষায় জানাতে হবে আন্দোলনের উদ্দেশ্য।
৪. সংগঠিত থাকা – নেতৃত্ব ও কর্মপন্থা স্পষ্ট হলে বিভ্রান্তি কমে।
৫. সচেতনতা সৃষ্টি – প্রচার, সভা, বিতর্ক, লিফলেট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে জনগণকে জাগানো।
৬. আইন ও নৈতিকতা মেনে চলা – যাতে সাধারণ মানুষ আন্দোলনের পাশে থাকে।
৭. ধৈর্য ও সহনশীলতা – আন্দোলনে বাধা আসবেই, তাই হতাশ না হয়ে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মানসিকতা রাখা।
আন্দোলনকারীদের অনুচিত:
১. সহিংসতা বা ভাঙচুর – এতে জনসমর্থন হারায়, শত্রুপক্ষ দমন করার অজুহাত পায়।
২. ব্যক্তিগত স্বার্থে আন্দোলন ব্যবহার – নেতৃত্ব যদি সুবিধাবাদী হয়, আন্দোলন দুর্বল হয়ে যায়।
৩. বিভক্তি তৈরি – ছোট ছোট গোষ্ঠী তৈরি করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা অনুচিত।
৪. ভুয়া তথ্য ছড়ানো – এতে আন্দোলনের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়।
৫. জনজীবন অকারণে পঙ্গু করা – অযথা কষ্ট দিলে সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়।
৬. অন্যের ধর্ম, সংস্কৃতি বা জাতিগত অনুভূতিকে আঘাত করা – এতে আন্দোলন ভিন্ন পথে চলে যেতে পারে।
৭. অসহিষ্ণুতা ও চরমপন্থা – দাবি আদায়ে অতি-উগ্রতা বরং আন্দোলনের ক্ষতি করে।
গণআন্দোলনের সফলতার জন্য প্রয়োজন শান্তিপূর্ণ সংগঠন, স্পষ্ট লক্ষ্য ও জনগণের আস্থা। অনুচিত কাজগুলো এড়িয়ে চললে আন্দোলন শুধু দাবি আদায়ই করে না, বরং দেশের ভবিষ্যৎ উত্তরণের পথও প্রসারিত করে।
গণবিদ্রোহ সবসময় শেষ পথ নয়:
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সুপ্রতিষ্ঠানের জন্য গণবিদ্রোহ কখনো প্রয়োজনীয় হতে পারে, কিন্তু এটি চূড়ান্ত সমাধান নয়। মূলত শান্তিপূর্ণ, সংবিধানগত ও নৈতিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করেই একটি দেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে।
১. কেন গণবিদ্রোহ সবসময় শেষ পথ নয়?
১. সহিংসতার ঝুঁকি:
গণবিদ্রোহ প্রায়শই রক্তপাত ও ধ্বংসের সঙ্গে যুক্ত। অনেক সময় সরকার পতনের পরও স্থায়ী স্থিতিশীলতা আসে না।
২. প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সুযোগ:

আইন, নির্বাচন, সংবিধান ও প্রশাসন সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তন আনা সম্ভব। দুর্নীতি, অপশাসন বা বৈষম্য মোকাবেলায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলনও কার্যকর।

৩. নাগরিক অংশগ্রহণ:

সমাজ সচেতন হলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বচ্ছ ও দায়িত্বশীল রাখা যায়। গণমাধ্যম, এনজিও, শিক্ষাব্যবস্থা ও সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে পরিবর্তন আসতে পারে।

২. কখন গণবিদ্রোহ প্রাসঙ্গিক হয়?

যখন সরকার বা প্রশাসন একেবারেই অচল। যখন সংলাপ, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ব্যর্থ হয়। যখন শোষণ ও অন্যায় এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে জনগণের অন্য বিকল্প থাকে না।

৩. বিকল্প পথসমূহ:

১. গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া: স্বচ্ছ নির্বাচন, জনসচেতনতা, অংশগ্রহণমূলক নীতি।

২. আইন ও নীতি প্রয়োগ: দুর্নীতি ও অপশাসন দমন, বিচার ব্যবস্থার স্বচ্ছতা।

৩. শিক্ষা ও সচেতনতা: নাগরিকরা নিজেদের অধিকার ও দায়িত্ব বুঝলে সরকারকে দায়িত্বশীল রাখা সহজ হয়।

৪. সংগঠিত আন্দোলন: শান্তিপূর্ণ, সংবিধানভিত্তিক, আইনি ও সামাজিক আন্দোলন।

গণবিদ্রোহ চূড়ান্ত সমাধান নয়; তবে তা যখন অব্যবস্থাপনা, শোষণ ও অন্যায় এতটাই প্রবল হয় যে শান্তিপূর্ণ ও প্রাতিষ্ঠানিক পথ ব্যর্থ হয়, তখন এটি প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

বিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো-যা শান্তিপূর্ণ ও নৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য।

গণবিদ্রোহের বিশিষ্ট পূর্বসুরি:

১. মহাত্মা গান্ধী (ভারত)

অবদান: ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে অহিংস গণআন্দোলনের পথপ্রদর্শক।

বিশেষত্ব: অহিংস প্রতিরোধ, সৎ নেতৃত্ব, 'সত্যাগ্রহ' ও 'অহিংসা' নীতি প্রয়োগ।

২. নেলসন ম্যান্ডেলা (দক্ষিণ আফ্রিকা)

অবদান: আপার্থেইড (বর্ণবাদী শাসন) বিরোধী গণআন্দোলনের নেতা।

বিশেষত্ব: দীর্ঘ ২৭ বছর কারাবাসের পরও শান্তিপূর্ণ সংলাপের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

৩. রোসা লুক্সেমবার্গ (জার্মানি/পোল্যান্ড)

অবদান: শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আন্তর্জাতিক নেতা।

বিশেষত্ব: সমাজতান্ত্রিক গণবিদ্রোহ ও শ্রমিক সংগ্রামে সক্রিয়।

৪. লক্ষ্মীভাই, ভীমরাও আম্বেদকর (ভারত)

অবদান: জাতিগত ও সামাজিক অন্যায়, অছুতোত্তর অধিকার রক্ষায় গণআন্দোলন।

বিশেষত্ব: সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণিকে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে গণবিদ্রোহকে সামাজিক দিকও প্রদান।

৫. শেখ মুজিবুর রহমান (বাংলাদেশ)

অবদান: ভাষা আন্দোলন ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের নেতা।

বিশেষত্ব: গণআন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম।

৬. ভল্টায়ার, রুশিয়া বিপ্লবের নেতা (লেনিন)

অবদান: সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব।

বিশেষত্ব: শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থে রাজনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের মূল নায়ক।

৭. মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র (যুক্তরাষ্ট্র)

অবদান: নাগরিক অধিকার আন্দোলনের নেতা।

৮. ভিক্টোর হুগো (অভিব্যক্তি/প্রভাব) ফ্রান্স ফরাসি গণআন্দোলনে সাহিত্য ও জনমত প্রভাবিত সামাজিক সচেতনতা ও আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করা

৯. চেতান খান (উদাহরণ) নেপাল রাজতন্ত্রবিরোধী গণআন্দোলন শান্তিপূর্ণ গণসংগ্রামের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

১০. মাও সে তুং চীন চীনা কমিউনিস্ট বিপ্লব কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিবর্তন।
বিশেষত্ব: অহিংস গণআন্দোলনের মাধ্যমে বর্ণবৈষম্য ও সামাজিক অন্যায় চ্যালেঞ্জ।
এই মানুষদের মূল বৈশিষ্ট্য হলো–সাহস, নেতৃত্ব, জনগণের স্বার্থে সংগ্রাম, এবং নৈতিক ও সাংগঠনিক দক্ষতা।
তারা দেখিয়েছেন, গণবিদ্রোহ কেবল শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্তরণের হাতিয়ার।

পরিশেষে বলা যায় গণবিদ্রোহ একটি বিশেষ রক্ষাকবজ যা দেশের সার্বিক কল্যাণে নাগরিকদের সঠিক দিশা দেখাতে পারে :
১. অধিকার ও স্বাধীনতার রক্ষা:
গণবিদ্রোহ মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রধান হাতিয়ার।
২. অন্যায় ও শোষণের অবসান:
এটি স্বৈরশাসন, দুর্নীতি ও শোষকের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদকে শক্তিশালী করে।
৩. সামাজিক ন্যায় ও সমতার প্রতিষ্ঠা:
গণবিদ্রোহ বৈষম্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে।
৪. সাংস্কৃতিক ও জাতীয় সচেতনতা:
আন্দোলন মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় পরিচয়ের সচেতনতা জাগ্রত করে।
৫. ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষণীয়তা:
সাহস, ঐক্য ও ন্যায়পরায়ণতার উদাহরণ হিসেবে গণবিদ্রোহ নতুন প্রজন্মকে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।
৬. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রভাব:
গণবিদ্রোহ শুধু দেশের জন্য নয়, বরং বিশ্বের জন্যও নৈতিক ও রাজনৈতিক উদাহরণ তৈরি করে।
গণবিদ্রোহ কেবল প্রতিবাদ নয়, এটি দেশের উত্তরণ, সামাজিক ন্যায় ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার এক উজ্জ্বল প্রতীক।
এটি দেখায় যে, জনগণের ঐক্য, সাহস ও সচেতনতা কোন স্বৈরশাসন বা শোষণকেই টিকিয়ে রাখতে পারে না।

জসীমউদ্দীনের 'কবর' : শতবর্ষে পুনঃপাঠ

ড. জীবনকুমার সরকার

জসীমউদ্দীন যে সময়ে বাংলা কাব্যভুবনে আবির্ভূত হন, সে-সময় বাংলা কাব্যভুবন রবীন্দ্রআবহে প্রায় সম্পূর্ণ মুখরিত। সমকালীন বাংলা কবিতার জগৎ সম্পৃক্ত ছিলো রবীন্দ্রশাসনে। তবু যাঁরা বাংলা কাব্যভুবনে রবীন্দ্রশাসনকে উপেক্ষা করে স্বমহিমায় জসীমউদ্দীনের মতো উদ্ভাসিত হবার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) প্রমুখ। এসব কবিদের বলা হতো তিরিশের কবিকুল।

তিরিশের কবিগ্রহে আবর্তিত হয়েও তিরিশের কবিবৃন্দের মতো জসীমউদ্দীন ইউরোপীয় ধ্যানধারণায় আত্মমগ্ন হননি। আবার রবীন্দ্রনাথের মতো রোমান্টিক বাচনে পরিসর খোঁজার চেষ্টাও করেননি। কিংবা, নজরুলের মতো তুমুল বিদ্রোহের কথনভঙ্গি রূপায়নে কবিসত্তার প্রকরণ নির্মাণ করতে চাননি। তিনি কবিতার বিষয়, ভাষা, বৈচিত্র্যে ও প্রকাশভঙ্গিতে একেবারেই স্বতন্ত্রতার দাবি রাখে। আলোচনার বিষয়-শিরোনাম সেদিক বিস্তৃত করতে দেবে না ব' লে আমাদের 'কবর' কবিতা মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে আলোচনার কথাবয়ন নিয়ে।

তাঁর একটি কালজয়ী কবিতার নাম 'কবর' ।

Sahityasena, a research and Creative literature oriented E-journal. Published by Farjina Parvin and edited by Sariful Islam. WhatsApp - 8617377896, Email - sahityasena@gmail.com, Website - sahityasena.com

কবিতাটি শতবর্ষের কালবেলায় দাঁড়িয়ে গেলো। আজকের এই আধুনিকোত্তর ভাববিশ্বে দাঁড়িয়ে তাঁর এই কবিতার অন্তঃস্বর নিয়ে কোন্ চিহ্ন উপস্থাপন করবো, তাই ভাববার বিষয়। কবিটির সমগ্র পঙক্তিই

পাঠকের ভেতরে তোলপাড় ক' রে। এক অনাবিল স্বাদ গ্রহণ করতে করতে ডুবে যায় আমাদের কবিতার স্নায়ু। কবিতার শুরুটাই আকর্ষণীয় দ্বিরালাপ তৈরি করে ফেলে —

"এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।"

বাংলা কাব্যভুবনে এই জাতীয় কবিতা আজও বিরল। কবিতাটি সৃজনের কাল থেকে আজ পর্যন্ত, অর্থাৎ শতবর্ষের মধ্যে আর কোনো কবির হাতে এমন কাব্যবয়ানের কবিতা আমরা পাইনি। তাহলে কোন দিক থেকে কবিতাটি শত বছরের গৌরবগাথা মাথায় করে মিনারের মতো দাঁড়িয়ে আছে? এই প্রশ্নের মীমাংসা জরুরী।

কবিতাটির প্রথম চার পঙক্তি উল্লেখ করা মাত্রই মননশীল পড়ুয়ারা আশাকরি অতি দ্রুত বুঝে গেছেন যে, জসীমউদ্দিন নাগরিক জীবনের কথা বলতে চাননি এই কবিতায়। কারণ, 'পুতুলের বিয়ে' ব্যাপারটাই মূলত গ্রামজীবনের বাল্য-শৈশবের খুব চেনা পারিবারিক চিত্র। গ্রামে বেড়ে উঠেছেন অথচ পুতুল খেলেননি এমন বাঙালি অন্তত আমাদের দুই বাংলায় নেই। খুব আশ্চর্য অনুভূতির মধ্যে দিয়েই আমি কবিতাটির শতবর্ষের পাঠ নিবিড়তায় মগ্ন হয়ে পড়ি। আর বারবার ক' রে নিজের সেই হারানো শৈশবের স্মৃতিগুলো এসে তুলে নিয়ে যায় হরিয়ে যাওয়া পুতুলের কাছে। কবর কবিতাটির আবেদন এমনই যে, হাজার হাজার বছর পরও বাঙালির হৃদয়ে বাঁশির সুরের মতো বাজবে। আমরা কি ভুলে থাকতে পারবো এই কাব্যস্বর —

"এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা,
সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা!
সোনালী ঊষার সোনামুখ তার আমার নয়নে ভরি
লাঙল লইয়া খেতে ছুটিলাম গাঁয়ের ও-পথ ধরি।"

সমগ্র বাংলা কাব্যভুবন খনন করলেও এমন কবাস্বর খুঁজে পাওয়া যায় না। মাটি আর মানুষের দ্বিরালাপে উচ্চকিত তাঁর কবিতা। ফলে 'কবর' র মধ্যেও চাপা পড়েনি সেটা। বঙ্গজীবনের লোকায়ত সংস্কৃতির বহুমাত্রিক চিত্রকর তিনি। যার ফলে লাঙল হাতে ক' রে খেতের দিকে ছুটে যাবার মুহূর্তেও কী সাবলীল ভাষায় মোহিনী আকর্ষণে আমাদের বিদ্ধ করেছেন —

"যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত
একথা লইয়া ভবি-সাব মোরে তামাশা করিত শত।
এমনি করিয়া জানি না কখন জীবনের সাথে মিশে
ছোট-খাট তার হাসি ব্যথা মাঝে হারা হয়ে গেনু দিশে।"

শতবর্ষ পরেও এর আবেদন এতটুকুও ফুরোয়নি। বরং এই মুহূর্তে বাঙালির উৎকট ভাববিশ্বে এর অন্তঃস্বর আমাদের বারবার ক' রে নতুন এক ভুবনের অনুসন্ধান দেয়।

আবহমান গ্রামবাংলার সংস্কৃতি ও সুখ-দুঃখের দক্ষ রূপকার যেনো তিনি। পাখির লঘু পালকের মতো পেলব হৃদয়ের মর্মস্পর্শী ভাষায় একজন বৃদ্ধের স্ত্রী শূন্যতার হাহাকার রূপায়িত হয়েছে এই কবিতায়। তাই এই কবিতায় জড়িয়ে আছে এক ধরনের সরল সুন্দর উন্মাদীয় ভাষা —

"বাপের বাড়িতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা
আমারে দেখিতে যাইও কিন্তু উজানতলীর গাঁ।"

এটা কেবল কবিতার ভাষা নয়, আটপৌরে বাঙালি জীবনের চিরায়ত ভাষা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্বামীর কাছে এই

আবদার অন্তেবাসীর নারীর যেন খুবই কাম্য। আজও পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যস্থা থেকে নারীর কোনো মুক্তি হয়নি। বরং, পুঁজিবাদ আর সর্বগ্রাসী পণ্যসংস্কৃতির ঘেরাটোপে নারী নতুনভাবে বন্দি আজকের বিশ্বে। তবে কবর কবিতার কথকের মধ্যে স্ত্রীর প্রতি যে অসীম ভালোবাসা পরিলক্ষিত হয়, তাতে উপর্যুক্ত দুই পঙক্তির পুরুষতান্ত্রিক আবিলতা ভেঙে চূর্ণ ক' রে দিয়েছেন —

" শাপলার হাটে তরমুজ বেচি দু' পয়সা করি দেড়ী,
পুঁতির মালার একছড়া নিতে কখনও হত না দেরি।
দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে,
সন্ধ্যাবেলায় ছুটে যাইতাম শ্বশুরবাড়ির বাটে!"

জসীমউদ্দীনের মতো কবিকে নাগরিক জীবনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তিনি আসলে অনেকার্থদ্যোতনা নিয়ে ছড়িয়ে আছেন গ্রামবাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। এই প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'জসীমউদ্দিন' নামক প্রবন্ধের কিছু অংশ তুলে ধরা সমীচীন মনে করছি —

" একেবারে সাদামাটা আত্মভোলা ছেলে এই জসীমউদ্দিন। চুলে চিরুনি নেই, জামায় বোতাম নেই, বেশব্যাসে বিন্যাস নেই। হয়তোবা অভাবের চেয়েও ঔদাসীন্যই বেশি। সরল শ্যামলের প্রতিমূর্তি যে গ্রাম তারই পরিবেশ তার ব্যক্তিত্বে, তার উপস্থিতিতে। কবিতায় জসীমউদ্দিন প্রথম গ্রামের দিকে সংকেত, তার চাষাভুষো, তার খেত খামার, তার নদীনালার দিকে। ... যে দৃশ্য অপজাতের হয়েও উঁচু জাতের। কোনো কারুকালার কৃত্রিমতা নেই, নেই কোনো প্রসাধনের পরিপাট্য। একেবারে সোজাসুজি মর্মস্পর্শী করবার আকুলতা। কোনো ইমেজের ছাঁচে ঢালাই করা নয় বলে তার কবিতা হয়তো জনতোষিণী, কিন্তু মনোতোষিণী।" (সূত্র: 'সময়ের ভিন্নস্বর' , জীবনকুমার সরকার, শিল্পনগরী প্রকাশনী, মুর্শিদাবাদ, প্রথম প্রকাশ: জুন ২০১৩, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঠিকই বলেছেন তাঁর কবিতায় আছে 'মর্মস্পর্শী করবার আকুলতা '। এই মর্মস্পর্শী আকুলতাই জসীমউদ্দীনের কবিতার বহুস্বরিক দিক। 'কবর' কবিতা শতবর্ষজুড়ে ওই আকুলতায় আমাদের নিমগ্ন রেখেছে।

কবিতার কথকের কাছে আবার ফিরে যেতে হচ্ছে একটু, ঠিক এইখানে —

" হেস না হেস না — শোন দাদু, সেই তামাক মাজন পেয়ে'
দাদি যে তোমার কত খুশি হত দেখিতিস যদি চেয়ে!
নথ নেড়ে নেড়ে কহিত হাসিয়া, এতদিন পরে এলে,
পথপানে চেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখিজলে।"

কবরের এই আকুলতা পাঠকহৃদয়ে শতবর্ষ পেরিয়ে আরও শতাব্দীর পর শতাব্দী বয়ে যাবে বেগবান স্রোতস্বিনীর মতো। কবিতাপ্রেমী বাঙালি যত ধরনের কবিতাই আস্বাদন করে থাকুক না কেনো, 'কবর' র মতো কবিতার স্বাদ আর কোনো কবির কাছে আশ্রয় নিলে পাওয়া যাবে না। এই কারণে কবরস্রষ্টা জসীম উদ্দিন সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন যথার্থই বলেছেন —

"ইনি তরুণ বয়স্ক কিন্তু বীরবিক্রম। ইঁনি
কবিতারাজ্যে যে পাঠশালা খুলিলেন, তাহা
ইহার নিজের আবিষ্কার। জানি না শহরে
থাকিয়া কবি তাঁহার এই সবুজ প্রাণ
বঙ্গজীবনের তুলনীয় গ্রাম্য সম্পদ ঘরকন্নার
এই সাঁঝের ভোগ হারাইয়া ফেলিবেন কিনা।"
(সূত্র: সময়ের ভিন্নস্বর, জীবনকুমার
সরকার, শিল্পনগরী প্রকাশনী,
মুর্শিদাবাদ, প্রথম প্রকাশ: জুন ২০১৩
পৃষ্ঠা: ৩৫)

একদম যথার্থ মূল্যায়ন। এরপর আমাদের মতো পাঠকদের পাঠপ্রতিক্রিয়ার আর বিশেষ কিছু থাকে না। শুধু এটাই ভাবি, গ্রামবাংলার এত রূপমাধুরী যাঁর

কবিতায়; তাঁকে বাঙালি ভুলে যেতে চায় কী ক' রে ?
সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার বাঙালি এখন শেকড়চ্যুত এক রুগ্ন জাতিগোষ্ঠী।
এই মুহূর্তে বাঙালির বিভাজ্য জাতি সত্তায় যেভাবে ভাঙন ধরছে ক্রমাগত, তাতে একটা মারাত্মক সংশয় জেগেছে অসম্প্রদায়িক বাঙালি চিন্তকদের মধ্যে। বাঙালি পড়ুয়ারা সাহিত্যের মতো বিষয়কেও এখন হিন্দু-মুসলমান নামক কাল্পনিক ভাগে ভাগাভাগি ক' রে নিয়েছে। অথচ, প্রকৃত বাঙালির হিন্দু মুসলমান ব' লে কিছু হয় না। মাতৃভাষা ও মাতৃ সংস্কৃতিই তার আধার। যার ফলে বাঙালির মূল ঐতিহ্যই হচ্ছে অসম্প্রদায়িক চেতনা। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে বলতে হচ্ছে, দুই বাংলার বাঙালিরা শেকড়চ্যুত হবার উদগ্র বাসনায় আজ আবার লিপ্ত। সুতরাং, জসীমউদ্দীনের মতো আপাদমস্তক বাঙালি কবির যে কোনো সৃষ্টিকে বুঝতে হবে মুক্তচিন্তার প্রেক্ষিতে। তাঁর সাময়িক যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় সহ বেশ কিছু পল্লিকবি বা গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রতিনিধি স্থানীয় কবিদের জন্য আমাদের প্রাণ যতটা কাঁদে, তার ছিটেফোটাও জসীমউদ্দিন জন্য হয় না অন্তত এই বঙ্গে। এজন্য কলকাতা কেন্দ্রিক একপেশে সাহিত্যচর্চা দায়ী। ভারতে বাঙালিদের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতা এখনও পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী সাহিত্যকেই প্রসারিত ক' রে বলে এই ধরনের উপেক্ষা লক্ষ করা যায়। অথচ, জসীমউদ্দীনের আকাশ অনেকটা বিস্তৃত। এই প্রসঙ্গে জসীমউদ্দিন সম্পর্কে অগ্রজ কবি কালিদাস রায়ের একটি মন্তব্য তুলে ধরা সমীচীন মনে করছি—

" যতীন্দ্রমোহন ও কুমুদরঞ্জন বঙ্গের পল্লিপ্রকৃতিকে দেখিয়াছেন হিন্দুর চোখে। শ্রীমান জসীমউদ্দিন বাঙালির চোখে দেখিয়াছেন অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান উভয়ের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন।"

কালিদাস রায়ের মন্তব্যের অন্দরে প্রবেশ করলেই বাঙালি পড়য়াদের পক্ষে জসীমউদ্দীনের মতো অনন্য কবির আলোড়িত কবিতা 'কবর' র রোমান্টিক মেদুরতা ও বহমান সময়ের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহন করা সম্ভব।

কবিতাটির শেষ চার পঙক্তি নির্মিত হয়েছে যেনো আমাদের হৃদয়কে আরও সংবেদনশীল ক' রে তোলার জন্য—

" আমাদের ছাড়িয়া এত ব্যথা যার কেমন করিয়া হায়,
কবর দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিঝঝুম নিরালায়।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ দাদু, আয় খোদা, দয়াময়,
আমার দাদীর তরেতে যেন গো ভেস্ত নসিব হয়।" ১২০১

সময়ের তমাসী রিক্ততা ছিন্ন ক' রে 'কবর' কবিতা শতবর্ষ স্পর্শ করেও নতুন সময়ের উপযোগী আত্মগত ভাষা রচনা ক' রে দেয়। কবিতাটির খণ্ডিত সময়ের নয়, মহাসময়ের এক দলিল। (শব্দসংখ্যা: ১২২৬)

নারী সংগ্রাম ও সাহিত্য দর্শনের পথপ্রদর্শক বেগম রোকেয়া

সেখ সানাউল

অতীতকাল থেকে আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসে সামাজিক অনাচার, ধর্মীয় বিদ্বেষ ও নারী নির্যাতন এক আলোড়িত বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। ফলে দেশ মাঝে মাঝে বড় অন্ধকারময় সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তাই পৃথিবীর বুকে অন্ধকার মুছে ফেলার জন্য যুগে যুগে মানবতার আদর্শ ছড়িয়ে দিতে বহু মহামানবের আবির্ভাব ঘটে। অন্ধকারে মানুষকে পথ দেখানোর জন্য প্রয়োজন হয় আলোর বিন্দুমাত্র ছটা। সমাজের এরকম সময়ে কিছু কিছু মানুষের জীবন সংগ্রাম, অসংখ্য মানুষের জীবনে আলোর উৎস হয়ে ওঠে। তারা মানুষকে নতুনভাবে বেঁচে থাকার, সংগ্রাম করার স্বপ্ন দেখায়। শুধু তাই নয় সমাজের মঙ্গলময় রাস্তাকে প্রশস্থ করার জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে, আমাদের এই ভূ-খণ্ডে তেমনি এক মহামানব, উজ্জ্বল নক্ষত্র, সূর্যের ন্যায় দীপ্ত প্রতিভা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন বেগম রোকেয়া। এই মহান নেত্রী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের জর্জরিত পীড়িত নারী সমাজকে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখেছেন পুরুষশাসিত

সমাজে নারীর অবমাননা, বৈষম্য, শিক্ষাহীনতার প্রবল অন্ধকার। এই জটিলতার বিরুদ্ধে পথ খোঁজার জন্য নতুন দিশার সন্ধান করেছেন। মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে উজাড় করে লড়েছেন অবিরাম। তিনি উপলব্ধি করেন শিক্ষার প্রবল গুণের মাধ্যমেই নারী মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তাঁর এই প্রতিবাদের পথ সহজ ছিল না। অপবাদ, গ্লানি ও নানান আঘাত সত্ত্বেও তিনি অবিচল ছিলেন। তাঁর শিক্ষাবিষয়ক রচনা, সমাজ-ভাবনা, নারীর মর্যাদাপূর্ণ জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা এবং সামাজিক জটিলতার বিশ্লেষণ-এসব আমরা তাঁর বই পাঠের মাধ্যমেই জানতে ও বুঝতে পারি। কিন্তু আমাদের স্মরণ করে নিতে হয় তাঁর চলার কাঁটাময় পথ, আত্মত্যাগ ও সহিষ্ণু মানসিকতার। কারণ এই চলার পথে বহু কাছের মানুষ তাঁর সঙ্গ দিতে অস্বীকার করেন।

এই মহান মানবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রামে। নিজের পরিবারেই দেখেছেন বৈষম্যের রূপ। তাঁর ভাইয়েরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল। কিন্তু তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় নারীদের গৃহের সীমানা পেরিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের কোনো সুযোগ ছিল না। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি অল্প কিছুদিন এক গৃহ শিক্ষিকার নিকট পড়ার সুযোগ পেলেও সমাজ ও আত্মীয়-স্বজনের বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সেই শিক্ষালাভও বন্ধ হয়ে যায়। তিনি অন্যায় প্রথার কাছে আত্মসমর্পণ না করে যোগ্যতা অর্জন করার চেষ্টা করেছেন। বড় ভাই - বোনদের সমর্থন ও সহায়তায় তিনি বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফারসি এবং আরবি আয়ত্ত করেন। তিনি যত বেশি শিক্ষিত হয়েছেন, ততই সমাজে অবদমিত নারীদের অপমান, বঞ্চনা ও বেদনার চিত্র স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছেন। তাই সারা জীবন তিনি সংগ্রাম করেছেন নারীর মর্যাদা, অধিকার ও মুক্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। তিনি নারীদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন — আমরা অলংকারের মতো সিন্দুকে বন্দী হয়ে থাকব না, পশুর মতো নির্বাকও থাকবো না। ভগিনীগণ, সমস্বরে বলো — " আমরা মানুষ "। তিনি লিখেছেন," আমরা অকর্মণ্য পুতুল জীবন বহন করার জন্য সৃষ্টি হয়নি — এ কথা নিশ্চিত"। তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের গর্ববোধকে ক্ষুণ্ন করে বলেছিলেন — কন্যাদের সুশিক্ষিত করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ দাও, তার নিজের পরিধেয় বস্ত্র ও দৈনন্দিন অন্ন নিজেরাই উপার্জন করুক। তিনি নারীদের অন্ধকারে চেপে যাওয়া মাথা গুলিকে ঊর্ধ্ব আকাশে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা করেন। দাসত্বকে ভেঙে ফেলার মন্ত্রণা দেন এই মহান লেখিকা।

সমাজের প্রতি কর্তব্য এবং সমাজের নিকট প্রাপ্য অধিকার উভয় যেন যুক্তি ও ন্যায়বোধ দ্বারা নির্ধারিত হয়, বেগম রোকেয়ার এই ছিল সমাজের কাছে মূল দাবি। দয়া নয়, করুণা নয়, তিনি চেয়েছিলেন মর্যাদা ও অধিকার - আর সেই আদর্শেই ছিলেন তিনি আজীবন সংগ্রামী। সেই কারণেই তাঁর গলায় ধ্বনিত হয়- "অনুগ্রহ করে আমাদের অনুগ্রহ করো না"। তিনি নারী সমাজকে সচেতন করে বলে নিজের মন ও কর্মগুণকে কখনই তুচ্ছ মনে করো না। তিনি শিখিয়েছেন শিক্ষা যেন অহমিকা বা অহংকারের বিষয় না হয়, শিক্ষা হলো সমাজকে আলো দেখানোর মাধ্যম। বাস্তব নিজ জীবনে বিয়ে, সংসার ও মাত্র ২৯ বছর বয়সে বিধবা হওয়ার মধ্য দিয়ে বুঝিয়েছিলেন সমাজে নারীদের অবস্থান কত দুর্বল। তাই তিনি নারী মুক্তির জন্য শিক্ষাকে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। স্বামী মৃত্যুর পর ১৯০৯ সালের ১ অক্টোবর স্বামীর প্রদত্ত অর্থে মাত্র ৫ জন ছাত্রী নিয়ে তিনি বিহারের ভাগলপুরে ' সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল ' স্থাপন করেন। কিন্তু তার এই প্রচেষ্টাকে বহু বাঁধা বিপত্তির সামনে পড়তে হয়।ফলে তিনি কলকাতা আসতে বাধ্য হন। ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ কলকাতার ১৩ নম্বর ওয়ালিউল্লাহ লেনের একটি বাড়িতে মাত্র ৮ জন ছাত্রী নিয়ে তিনি নবপর্যায়ে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন।আর্থিক অনটন, ছাত্রী জোগাড়, সামাজিক বাধা অতিক্রম করে অবিচল ছিলেন শিক্ষা বিস্তারের কাজে। সমাজের মূল্যবান অঙ্গ নারীদের পিছিয়ে কোনদিন সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না একথা সারা জীবন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে প্রচারিত হয়েছে। ১৯০৪ সালে তিনি 'মতিচুর গ্রন্থে' লেখেন - "আমরা সমাজের অর্ধঅঙ্গ"। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কি প্রকারে। ১৯০৫ সালে 'সুলতানার স্বপ্ন' উপন্যাসে তিনি উল্টো পথের সমাজ কল্পনা করেন, যেখানে নারীরা শাসন ক্ষমতায় এবং পুরুষরা গৃহবন্দী। এটি শুধু কল্পকাহিনী নয়, বরং সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যের তীব্র ব্যঙ্গ। রোকেয়ার লেখার ভাষা ছিল সহজ, কিন্তু যুক্তি ছিল ধারালো। তিনি ব্যঙ্গ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাঠককে ভাবতে বাধ্য করতেন।

তিনি মুসলিম সমাজের বাধা-বিপত্তি ও গোড়ামী ঝেড়ে ফেলার জন্য প্রবল প্রচেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর লেখনি শক্তির দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করেন ধর্ম কোনদিন মানুষকে পিছিয়ে থাকার কথা শেখায় না। শুধুমাত্র সঠিক অনুধাবন প্রয়োজন হয়ে থাকে। কিন্তু স্বার্থপর লোকে স্বার্থ পূরণের জন্য নারী সমাজকে তারা অন্ধকারে ঠেলে দেয়। এই শ্রেণীর উচ্ছেদের জন্য, তাদের কু- মতলব কে পেছনে ফেলার জন্য তিনি বারংবার সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। কিন্তু কালের নিয়মেই বিশ্ব মায়ের এই মাটি ছেড়ে, জগৎ কে আলোর নিশানা দেখিয়ে নারী সমাজকে নতুন জীবনরেখা দিয়ে, জগতের মধ্যে উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে এই মহামানবীর ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর মাত্র ৫২ বছর বয়সে তাঁর সংগ্রাম জীবনের অবসান ঘটে যায়।

বেগম রোকেয়ার অবদানকে শুধু নারী শিক্ষার সীমায় বাঁধা যায় না। তিনি ছিলেন মানসিক বিপ্লবের স্থপতি। তাঁর জীবন ও কর্ম আমাদের মনে করিয়ে দেয়, প্রতিকূল সমাজেও একজন মানুষ নিজের দৃঢ়তা ও সাহস নিয়ে ইতিহাস বদলে দিতে পারে। তাঁর এই জীবন সংগ্রাম থেকে সমাজকে শিক্ষা নিতে হবে, যে কাজ তিনি অসম্পূর্ণ রেখেছেন সেই কাজকে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের সকলের। তিনি যে পথে দিশা দেখিয়েছেন, তাকে উজ্জীবিত রাখার দায়িত্ব সকলের। তিনি সমাজের কাছে, নারী জগতের কাছে এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিরজীবন মনে স্থান পাবেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে অসহায় মানুষের খাদ্য সংকট

ড. উমার ফারুক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের এক চিরস্মরণীয় শিল্পী । কথা সাহিত্যিক হিসেবে তিনি পাঠক হৃদয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তিনি জীবনকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে উপলব্ধি করেছেন এবং দক্ষ শিল্পীর ন্যায় তা রচনার মধ্যে বাস্তবসম্মত ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে তার ছোটগল্প-উপন্যাস। সাধারণ মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের সংগ্রাম তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন।তবে তাঁদের পূর্বপুরুষের বাস ঢাকার বিক্রমপুরে।তাঁর বাবা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা নীরদা সুন্দরী দেবী।মানিক বাবা মায়ের চৌদ্দ সন্তানের মধ্যে পঞ্চম সন্তান।তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।তবে বাড়িতে তাঁকে মানিক বলে ডাকতো।তাঁর প্রথম গল্প পত্রিকায় প্রকাশিত হয় মানিক নামে।তাই লেখক হিসেবে তিনি মানিক নামেই প্রসিদ্ধ লাভ করেন।তাঁর বাবা সেটেলমেন্ট বিভাগের কানুনগো ছিলেন পরবর্তীতে সাব ডেপুটি কালেক্টর পদে উন্নীত হন।বাবা চাকরিসূত্রে বিভিন্ন স্থানে বদলি হওয়ায় মানিকের বাল্য ও কৈশোর বাংলা, বিহার ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলে কেটেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প 'অতসী মামি' প্রকাশিত হয় বিখ্যাত পত্রিকা 'বিচিত্রায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায়(১৯২৮ সালের ডিসেম্বর)।সেই সময় মানিক বিএসসি প্রথম বর্ষের ছাত্র।তিনি বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে এই গল্পটি লিখেছিলেন।'অতসী মামি' গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিচিত্রা পত্রিকার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পত্রিকা ও সাম্মানিক নিয়ে স্বয়ং উপস্থিত হন মানিকের বাড়িতে।তিনি তাঁকে আরও গল্প লেখার অনুরোধ জানান।পত্রিকা সম্পাদকের অনুরোধে উৎসাহিত হয়ে মানিক ছোটগল্প লেখায় মনোনিবেশ করেন।আর বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে আবির্ভাব ঘটে গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।তাঁর ছোটগল্প গ্রন্থের সংখ্যা ১৬টি এরমধ্যে মোট ছোটগল্পের সংখ্যা ২৭১টি।

পরাধীনতার গ্লানি,যুদ্ধের ভয়াবহতা ও দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর সমাজ জীবনে বিপর্যয় মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের যে অবক্ষয় সৃষ্টি করেছিল তার টুকরো টুকরো ছবি তিনি দক্ষতার সহিত তুলে ধরেছেন তার কথাসাহিত্যে।১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ১৩৫০বঙ্গাব্দের বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর দেখা যায় যা পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে পরিচিত।এই মন্বন্তর নিয়ে সবচেয়ে বেশি গল্প লিখেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।দুর্ভিক্ষের পরের বছর ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন এবং আজীবন এই দলের সদস্য ছিলেন।সেই সঙ্গে তিনি ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মার্কসবাদে বিশ্বাসী মানিকের গল্পে সর্বহারা নিরন্ন, বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষগুলো বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।মন্বন্তরের প্রভাবে মানুষের অন্ন,বস্ত্র ও বাসস্থান এই তিন মৌলিক অধিকারই বিপন্ন হয়ে পড়ে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিউবিস্ট গোত্রের শিল্পী- যেখানে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে সমাজ সচেতন শিল্পবুদ্ধি জটিল অথচ নির্ভুল যুগমন কে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছে।"

পঞ্চাশের মন্বন্তর তাঁর গল্পে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। এই পর্বের গল্পগুলি তাঁর 'আজকাল পরশুর গল্প'(১৯৪৬), 'পরিস্থিতি'(১৯৪৬), ' খতিয়ান '(১৯৪৭) ও 'ছোটবড় '(১৯৪৮) ছোটগল্প গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খাদ্য সংকট নিয়ে বহু গল্প লিখেছেন।এখানে তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প আলোচনা করা হলো।

Sahityasena, a research and Creative literature oriented E-journal. Published by Farjina Parvin and edited by Sariful Islam. WhatsApp - 8617377896, Email - sahityasena@gmail.com, Website - sahityasena.com

কে বাঁচায়, কে বাঁচে! (১৯৪৩):

মানিকের এই গল্পটি খাদ্য সংকটের এক জীবন্ত দলিল।গল্পটি শুরু হয়েছে এইভাবে - "সেদিন আপিস যাবার পথে মৃত্যুঞ্জয় প্রথম মৃত্যু দেখল-- অনাহারে মৃত্যু।এতদিন শুধু শুনে আর পড়ে এসেছিল ফুটপাথে মৃত্যুর কথা,আজ চোখে পড়ল প্রথম।" অনাহারে মৃত্যুর এই ঘটনা গল্পের কাহিনি নিয়ন্ত্রণ করেছে।এই মৃত্যু মৃত্যুঞ্জয়ের মনে বেদনাবোধ জাগ্রত করেছে।সে তার সহকর্মী নিখিলকে এই ঘটনার কথা বলেছে।তার মানসিক ও শরীরিক কষ্ট হচ্ছে এটা তার সহকর্মীও বুঝতে পারে।মানুষের অনাহারে মৃত্যুতে মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে অপরাধবোধ সৃষ্টি হয়েছে।তার মনে হয়েছে, "ভাবছি, আমি বেঁচে থাকতে যে লোকটা না খেয়ে মরে গেল, এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কী? জেনে শুনেও এতকাল চারবেলা করে খেয়েছি পেট ভরে।"

এর প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য মৃত্যুঞ্জয় তার মাসের সমস্ত মাইনে নিখিলকে তুলে দিয়ে কোনো রিলিফ ফান্ডে দিতে বলেছে।শুধু তাই নয় সে অফিসে দেরি আসে আবার বেরিয়ে যায়।শহরের ফুটপাথে ঘুরে ঘুরে অভুক্ত মানুষের খোঁজ নিয়ে বেড়ায়।একসময় অফিস আসা বন্ধ করে সে অভুক্ত মানুষের সঙ্গে ফুটপাথে থাকে ও লঙ্গরখানায় খিচুড়ি খায়।গল্পটি এভাবেই সমাপ্ত হয়েছে।

সাড়ে সাত সের চাল(১৯৪৪):

এই গল্পে খাদ্য সংকটের এক ভয়াবহ চিত্র মানিক বাস্তবসম্মত ভাবে তুলে ধরেছেন।গল্পের প্রধান চরিত্র সন্ন্যাসী এই সংকট কালে অনেক কষ্ট করে সাড়ে সাত সের চাল সংগ্রহ করেছে।সেই চাল নিয়ে সে রাতের বেলা তার পলাশমতি গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে।বাড়িতে স্ত্রী সন্তান অভুক্ত আছে তাদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার তাগিদে ভোরের অপেক্ষা না করে সে রাতেই পথ চলা শুরু করেছে।সে মনে মনে কল্পনা করে, " না খেতে পেয়ে ক জন তার বাড়িতে ইতিমধ্যে মারা গেছে কে জানে। ক জন মরোমরো হয়ে আছে তাই বা কে জানে।...তার সাড়ে সাত সের চালের দুমুঠো নিয়ে সিদ্ধ করে আজ মাঝরাত্রেও দিতে পারলে যারা জীবন মরণের সীমারেখায় টলমল করার বদলে বেঁচে যাওয়ার দিকেই কোনোমতে টলে পড়তে পারবে।"

সন্ন্যাসী সালাতি গ্রাম অতিক্রম করে পলাশমতিতে প্রবেশ করে দেখে বাড়িঘর জনশূন্য।সন্ন্যাসী প্রিয়জনদের নাম ধরে ডাকলো কিন্তু কোন সাড়া পেল না।" গলা চিরে গেল, বুক ফেটে গেল ।তবুও তো সাড়া নেই।তখন সন্ন্যাসীর চোখে পড়ল, দরজার কড়ায় আটকানো তালার দিকে।তালাটা একটা কড়ায় ঝুলছে আর একটি কড়া ভেঙে খসে এসেছে দরজা থেকে।... কোনো ঘরে কেউ নেই।তালা দিয়ে সবাই পালিয়েছে।"

সন্ন্যাসী তার সাড়ে সাত সের চালের পুটুলি দাওয়ায় নামিয়ে ভাবতে থাকে।" এক সময় দাওয়া থেকে হুমড়ি দিয়ে উঠোনে পড়ে সন্ন্যাসী নিঃশব্দে মরে গেল।" স্বজন হারানোর আঘাত সন্ন্যাসী সহ্য করতে পারে নি। এখানেই গল্পের সমাপ্তি।

আজকালপরশুর গল্প(১৯৪৫):

দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে লেখা এই গল্পে খাদ্য সংকটের ফলে বিপন্ন মানুষের আত্মমর্যাদা,নারীর সতীত্ব ভূলুণ্ঠিত হওয়ার কথা বাস্তবসম্মত ভাবে ফুটে উঠেছে।মানসুকিয়া গ্রামের রামপদের স্ত্রী মুক্তা দুর্ভিক্ষের কবল থেকে শিশু সন্তানকে বাঁচাতে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছে।তাকে গ্রামে দাস মশাইয়ের ঘৃণ্য লালসার শিকার হতে হয়েছে।শহরে এসেও তার সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে ।অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে মারা যায় তার শিশু সন্তান।তবে গল্পের এখানেই শেষ নয়।গল্পকার মুক্তাকে তার স্বামীর কাছে ফিরিয়ে এনে তাকে সংসারে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।তাতে বাধ সেধেছে ঘনশ্যামের মতো সমাজপতিরা।মুক্তা স্বামীর কাছে ফিরে এসে অকপটে স্বীকার করে সব সত্যি।সে বলে, "খোকন গেল কুপথ্যি খেয়ে ।মাই-দুধ শুকিয়ে গেল, এক ফোঁটা নেই।চাল গুঁড়িয়ে বার্লির মতন করে দিলাম ক'দিন। চাল ফুরোলে কি দিই! না খেয়ে শুকিয়ে মরবে এমনিতে, শাকপাতা যা সেদ্ধ খেতাম,তাই দিলাম, করি কি! তাতেই শেষ হলো।"

মুক্তা স্বামীকে জানিয়েছে খাদ্যের অভাবে সন্তানের মৃত্যুর কথা।সেই সঙ্গে জানিয়েছে নিজের সতীত্ব রক্ষার লড়াইয়ের কথা।মুক্তা বলে, " খোকন মরলো, তোমার কোন পাত্তা নেই।দাসমশায় রোজ পাঠাচ্ছে নেড়ীর মাকে।দিন গেলে একমুঠো খেতে পাই নে।এক রাতে দু'টো মদ্দ এলে,কামড়ে দিয়ে বাদাড়ে পালিয়ে বাঁচলাম এতটুকুর জন্যে।"

এদিকে মুক্তার সমাজে পুনর্বাসন বিষয়ে সমাজপতিদের ডাকা বিচারসভা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।করালী বলে, "ঠিক কথা,গাঁয়ে খেতে পায়নি,সোয়ামী কাছে নেই, তাই সদরে খেটে খেতে গেছে।ওর দোষটা কিসের?"

গল্পে মুক্তার সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা সমাজপতিদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ধ্বনিত হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খাদ্য সংকট নিয়ে লিখেছেন প্রাণের গুদাম(১৯৪৬) গল্পটি।গল্পে দেখা যায় একদিকে অর্থলোভী ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা লাভের আশায় খাদ্য দ্রব্য সঞ্চয় করে রেখেছে অন্যদিকে অনাহারে মানুষ মরছে।গুদামে খাদ্যে পচন ধরেছে তার গন্ধ আসছে কিন্তু মানুষ খেতে পাচ্ছেনা।এছাড়াও নেড়ী, প্রাণ,অমানুষিক, ছিনিয়ে খায়নি কেন এই গল্পগুলিতেও দুর্ভিক্ষ,অনাহারের বাস্তব নমুনা গল্পকার তুলে ধরেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন ১৯৫৬ সালের ৩ ডিসেম্বর।তাঁর মৃত্যুর পর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে তাঁর স্মরণসভায় সজনীকান্ত দাস বলেন,"মানিক শুধু বাংলা ও ভারতীয় সাহিত্যেরই একজন মুখ্য কথাশিল্পী নন,আমার জানা-বোঝার মধ্যে বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলির মধ্যে মানিকের অন্তত পাঁচটি সৃষ্টি পড়বেই।" মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আজও চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর কালজয়ী সৃষ্টির জন্য।